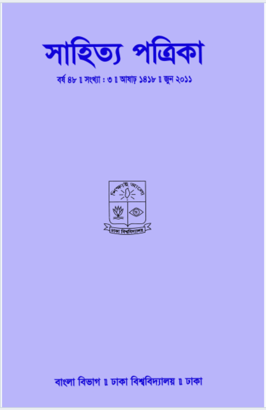

Vol. 48 | No. 3 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

উপভাষাতত্ত্ব ও বাংলা উপভাষা চর্চার সম্ভাবনা

Volume	48
Issue	3
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Hakim Arif
Published online	June 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v48i3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v48i3.3
Pages	৪৭-৭৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

উপভাষাতত্ত্ব ও বাংলা উপভাষা চর্চার সম্ভাবনা

Check for updates

হাকিম আরিফ*

ভাষা নামক জটিল সংশ্রয়ের একটি রূপান্তর হচ্ছে উপভাষা। আর এই রূপান্তর প্রপঞ্চটি অনেকটাই উপলব্ধি-সমর্থ, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণযোগ্য। ভাষা ও উপভাষাকে যখন অভিন্ন প্যারাডাইমের অংশ মনে করা হয়, তখন ভাষা নামক বিমূর্ত ভাবনার মূর্ত প্রকাশ হচ্ছে উপভাষা। আসলে ভাষা নামক ধারণাটি কিছুই বুঝায় না, যদি না আমরা এর রূপ-রূপান্তরের নানা মাত্রা যথা — ব্যক্তি ভাষা, সমাজ ভাষা, উপভাষা ইত্যাদিকে প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হই। ধ্বনিতত্ত্বের 'ধ্বনিমূল' নামক মনস্তাত্ত্বিকভাবে উপলব্ধ এককের (পার্কার ও রাইলে, ১৯৯৪) বাস্তব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকাশ হিসেবে 'সহ-ধ্বনিমূল' যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ভাষার মূর্তায়নে উপভাষাও অনেকটা তাই। ভাষা বিশ্লেষণতত্ত্বে 'উপভাষা' অভিধাটি মূলত একটি ভাষার স্থানিক ও ভৌগোলিক প্রকাশকেই চরিতার্থ করে, যদিও এর অন্যমাত্রিক প্রকাশও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বাংলা 'উপভাষা' পরিভাষাটির ব্যবহার কি উপভাষা ধারণার কোনো নেতিবাচকতাকে সূচিত করে? অর্থাৎ 'উপভাষা' কি একটি ভাষার অশিষ্ট, ইতর বা উন রূপের পরিচায়ক? এ প্রশ্নগুলির অবতারণা করা হয়েছে এ জন্যে যে, একসময় উপভাষাকে শিষ্ট বা প্রমিত রূপের ইতর বা বিকৃত প্রকাশ বলে মনে করা হতো। কেননা আধুনিক নাগরিক জন-মানসে এই ধারণা প্রচলিত আছে বলেই শহুরে শিক্ষিত সমাজ উপভাষাকে বর্জন করে নাগরিক মান ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে (শহীদুল্লাহ, ১৯৯৮ [১৯৬৫])। অবশ্য বর্তমানে এ ধারণার অবসান ঘটেছে (শিলিং-এসটেস, ২০০৬) এবং এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আজকে যে রূপটি একটি ভাষার শিষ্ট বা প্রমিত রূপ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে, সেটি মূলত সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণি কর্তৃক ব্যবহৃত পরিস্রুত রূপ ব্যতীত আর কিছুই নয় (ইসলাম, ১৯৯৮; মনিরুজ্জামান, ১৯৯৪)। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা ভাষা অঞ্চলে যে রূপটি আজ প্রমিত রূপ হিসেবে সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে, তা কলকাতার নিকটবর্তী নদীয়ার কৃষ্ণনগরে প্রচলিত উপভাষারই একটি রূপ (মোরশেদ ২০০৭, হালদার ১৯৮৬, শহীদুল্লাহ ১৯৬৫)।[১] মূলত একটি ভাষিক জনগোষ্ঠীর যে অঞ্চলটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচর্যায় দীর্ঘদিন ধরে প্রাধান্য বিস্তারকারী, সে অঞ্চলের বিশেষ ভাষা-রূপটিই ঐ ভাষার মান বা প্রমিত রূপ হিসেবে সমাদৃত হয়, যেখানে পার্শ্ববর্তী ও দূরবর্তী অঞ্চলের ভাষারূপগুলো কেন্দ্রের সঙ্গে দূরত্বের আনুপাতিকতায় সুবোধ্য বা দুর্বোধ্য উপভাষারূপে অভিধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। এখানে কেন্দ্র বলতে প্রমিত ভাষার স্বীকৃতিবাহী অঞ্চলকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ শিষ্ট ও উপভাষার পরিচয় নির্ধারণেও আর্থ-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সুবিধা ও বঞ্চনাই যথাক্রমে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে, যদিও তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তা অনেক সময় সমর্থিত নয়। এই সংক্ষিপ্ত ও

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বর্ণনামূলক প্রবন্ধে উপভাষাতত্ত্বের আলোকে বাংলা উপভাষা চর্চার প্রধান প্রবণতা, বৈশিষ্ট্য ও নতুন সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি উপভাষা ধারণার একটি তাত্ত্বিক কাঠামোও এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১. উপভাষাতত্ত্ব : বৈশিষ্ট্য ও রূপসমূহ

১.১ উপভাষার সংজ্ঞা : ভাষার স্থানিক, কালিক ও ব্যক্তিক সত্তা

ভাষাবিজ্ঞানে উপভাষা চর্চা সংক্রান্ত সহ-শাস্ত্রটি হচ্ছে উপভাষাতত্ত্ব। বর্তমানে উপভাষাতত্ত্বে ভাষার স্থানিক, কালিক, ব্যক্তিক, সামাজিক ইত্যাকার বিবিধ রূপগত দৃষ্টিকোণ থেকে উপভাষা চর্চার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হলেও (ট্রাডগিল, ১৯৯৪), উপভাষার সংজ্ঞা নির্ধারণে ভাষার স্থানিক রূপের নানা মাত্রিকতাই দীর্ঘদিন ধরে প্রাধান্য লাভ করে আসছে। অর্থাৎ উপভাষা বলতে প্রচলিত অর্থে একটি ভাষার অঞ্চলভিত্তিক রূপবৈচিত্র্যকেই বুঝানো হয়ে থাকে। চেম্বার্স ও ট্রাডগিল (১৯৯৮) উপভাষার সংজ্ঞার্থ নির্মাণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, উপভাষা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ভাষার উপ-বিভাগ যেটি ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ ভাষার অন্য কোনো রূপ বা বিভাগের তুলনায় উন বা ইতর নয়। তবে এই সংজ্ঞার্থে ভাষা ধারণার সঙ্গে উপভাষার একটি সুনির্দিষ্ট পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। যদিও ভাষা ও উপভাষার সীমারেখা ও পার্থক্য সর্বদা স্পষ্ট নয় (ইসলাম, ১৯৯৮), তবু চেম্বার্স ও ট্রাডগিল (১৯৯৮) এ বিষয়ে যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তা এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। তাঁদের মতে, উপভাষা হচ্ছে একটি ভাষার অঞ্চলভিত্তিক রূপভেদ যা সবসময় ঐ ভাষার অন্য উপভাষী কর্তৃক পরিপূর্ণভাবে বোধগম্য নয়। অন্যদিকে প্রমিত ভাষা হচ্ছে পারস্পরিক বোধগম্যতা (mutual inteligibilily)-সম্পন্ন কিছু উপভাষার সমষ্টি যা ঐ ভাষার সকলেই মোটামুটিভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, পাশাপাশি একভাষীরা অন্যভাষীর ভাষা বুঝতে পারে। কিন্তু এই পার্থক্যটি অনেক সময় খুব জোরালো নয়। কেননা, তাঁদের ভাষায়, নরওয়েজীয়, সুইডিশ ও ডেনিশ তিনটি পৃথক ভাষা হলেও সংশ্লিষ্ট ভাষীরা এই তিনটি ভাষা বুঝতে পারে, অর্থাৎ তাদের কাছে বোধগম্য। তাহলে কি এ তিনটি একটি ভাষার উপভাষা? এতদ্ব্যতীত জার্মান ভাষার কিছু উপভাষা আছে যা এর অন্য উপভাষীর দ্বারা সহজে বোধগম্য নয়। বাংলার ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। যেমন, চট্টগ্রামি বা সিলেটি উপভাষা বাংলার অন্য জনগোষ্ঠীর দ্বারা অতি অল্পই বোধগম্য হয়। এ জন্যে মাঝে মাঝে ভাষা ধারণাটি নির্ধারণের জন্য ঐতিহাসিক কারণ, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও সর্বোপরি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন পড়ে। যেমনটি হয়েছে স্ক্যান্ডিনেভীয় উপরিউক্ত তিনটি ভাষার ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে একটি ভাষার বিভিন্ন ভাষিক উপদানের উন্নয়ন যথা — পরিভাষা নির্মাণ, কোডায়ন, লিপি প্রচলন ইত্যাদি ঘটে থাকে। ভাষা ও উপভাষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হচ্ছে, ভাষার লিপি পদ্ধতি বর্তমান থাকে, উপভাষায় যেটি অনুপস্থিত।

উপভাষার ধারণাটি যদি কালের পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয় তাহলে বলা যেতে পারে যে, একটি ভাষাবংশের সকল পৃথক ভাষাই ঐ

ভাষাবংশের প্রধান ভাষার উপভাষা, যেগুলো মূলত কালের বিবর্তনে ভাষিক রূপগত পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করেছে।

ভাষা ও উপভাষা অভিধা দুটিকে আবার ফের্দিন দ্য স্যোসুরের 'লাঙ' ও 'পাঅল' — এ দুটি দ্বৈততার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে 'লাঙ' হচ্ছে ভাষা যা একটি ভাষার বিমূর্ত সামষ্টিক রূপ; আর 'পাঅল' হচ্ছে ঐ ভাষারই উপভাষা, যা ব্যক্তিভাষার স্বতন্ত্র রূপ ও তার সামূহিক প্রকাশ।

১.২ উপভাষাতত্ত্ব ও উপভাষার ভৌগোলিক-সামাজিক সত্তা

একটি দেশের ভৌগোলিক ও সামাজিক স্তর বিন্যাসের নিরিখে সংশ্লিষ্ট ভাষার উপভাষাসমূহের ভৌগোলিক ও সামাজিক সত্তার স্বরূপ কী হবে তাও উপভাষাতত্ত্বের কেন্দ্রীয় বিবেচনার বিষয়। চেম্বার্স ও ট্রাডগিল (১৯৯৮) এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণার অবতারণা করেছেন।

১.২.১ ভৌগোলিক উপভাষা-ধারাবাহিকতা (geographical dialect continua)

এ উপপ্রমেয়টি একটি ভাষার বিভিন্ন উপভাষার ভৌগোলিক দূরত্বের সম্পর্কমাত্রাকে বিবৃত করে। অন্যভাবে বলতে গেলে, ভাষার বিভিন্ন উপভাষা কেন্দ্রের প্রমিত রূপের আপেক্ষিক দূরত্বের ব্যাপ্তি অনুসারে পারস্পরিক বোধগম্যতার একটি শৃঙ্খল তৈরি করে। অর্থাৎ কেন্দ্রের প্রমিত রূপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপভাষার দূরত্ব যত কম, তার বোধগম্যতার মাত্রা তত বেশি। উদাহরণস্বরূপ, 'ক' উপভাষাটি যদি প্রমিত রূপের সবচেয়ে কাছে সংস্থাপিত থাকে, তবে কেন্দ্রের মানুষের কাছে এটি সবচেয়ে বেশি বোধগম্য। অন্যদিকে 'প' উপভাষা যেটি প্রান্তে অবস্থান করে, তা কেন্দ্রের লোকদের কাছে এক ধরনের আপাত দুর্বোধ্যতা তৈরি করে।

১.২.২ স্বয়ংরূপতা ও নির্ভরশীল ভিন্নরূপতা

উপরিউক্ত তাত্ত্বিক ধারণার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে চেম্বার্স ও ট্রাডগিল (১৯৯৮) প্রস্তাব করেন স্বয়ংরূপতা (autonomy) ও নির্ভরশীল ভিন্নরূপতা (heteronomy) নামক দুটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিভাষা। তাঁদের মতে, স্বয়ংরূপতা কোনো ভাষার প্রমিত বা কেন্দ্রীয় রূপের বৈশিষ্ট্যসমূহ যা এর অনিবার্য স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থাকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে, নির্ভরশীল ভিন্নরূপতা হচ্ছে একটি ভাষার উপভাষা-ধারাবাহিকতার শৃঙ্খলভুক্ত বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্যাবলি যা কেন্দ্রের প্রতি ঐ রূপসমূহের (varieties) নির্ভরশীল অবস্থাকে সূচিত করে। প্রকৃতপক্ষে একটি ভাষার নির্ভরশীল বিভিন্ন উপভাষার শ্রীবৃদ্ধি তথা নতুন শব্দসম্ভার সৃষ্টি, লিপি সৃজন ইত্যাদি কেন্দ্রীয় স্বয়ংসিদ্ধ রূপটির ওপর ভিত্তি করেই নির্মিত হয়। এ অর্থে উপভাষাসমূহ সংশ্লিষ্ট ভাষার কেন্দ্রীয় রূপের ওপর নির্ভরশীল ভিন্নরূপ ছাড়া অন্য কিছু নয়। উদাহরণস্বরূপ, চেম্বার্স ও ট্রাডগিল (১৯৯৮) উল্লেখ করেছেন যে, জার্মান ভাষার পশ্চিম শাখার উপভাষাসমূহ যেগুলো আজ রাজনৈতিকভাবে হল্যান্ডে অবস্থিত, তাদের উন্নয়ন ও শ্রীবৃদ্ধি ডাচ ভাষাকে কেন্দ্র করেই সাধিত হচ্ছে। অপরদিকে, জার্মান ভাষার অন্য রূপগুলোর যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড (যেগুলো জার্মানিতে অবস্থিত) মূল জার্মানকে কেন্দ্র

করেই রূপায়িত হচ্ছে। ফলে পশ্চিম শাখার উপভাষাসমূহ এখন ডাচ ভাষার মূল রূপের ওপর নির্ভরশীল, অন্যদিকে অন্য শাখার উপভাষা-রূপসমূহ মূল জার্মানের ওপর নির্ভরশীল ভিন্নরূপ হিসেবেই ক্রিয়াশীল। এ বিষয়টি নিম্নোক্ত চিত্রে রূপাবয়ব লাভ করে (চেম্বার্স ও ট্রাডগিল (১৯৯৮) অনুসরণে)।

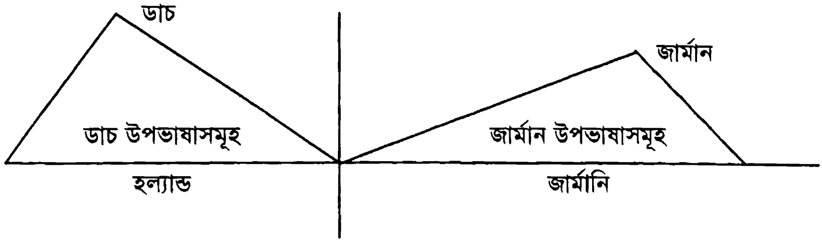

চিত্র -১ : জার্মান উপভাষাসমূহের নির্ভরশীল ভিন্নরূপতা

তাহলে দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাই কোনো ভাষার স্বয়ংরূপতা ও নির্ভরশীল বিভিন্নতা তৈরি করে, যা উপরের চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যায় যে, দক্ষিণ সুইডেনের মালমো ও লুন্ড শহরের পার্শ্ববর্তী সুইডিশ উপভাষাসমূহ ১৬৫৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত ডেনিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এটি সুইডিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তর হওয়ার পর দীর্ঘকালের পরিক্রমায় ডেনিশ উপভাষা-ধারাবাহিকতার অন্তর্ভুক্তির ফলে এ অঞ্চলের ভাষারূপগুলি ডেনিশ কেন্দ্রীয় রূপের নির্ভরতা ত্যাগ করে বর্তমানে সুইডিশ ভাষার কেন্দ্রীয় রূপের ওপর নির্ভরশীল ভিন্নরূপে বিকশিত হয়েছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনায়। চেম্বার্স ও ট্রাডগিলের উপরিউক্ত উপপ্রমেয়কে বিবেচনায় এনে আমরা বলতে পারি যে, বাংলা অঞ্চলে রাজনৈতিক কারণে অনুরূপ ভাষা পরিস্থিতি তৈরি না হলেও ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তিজনিত কারণে অখণ্ড বাংলা প্রদেশের রাজনৈতিক দ্বিখণ্ডনের ফলে এক ধরনের দ্বৈত স্বয়ংরূপতার (double autonomy) পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। কেননা বঙ্গবিভাগের কারণে এখন পশ্চিমবঙ্গের বাংলা উপভাষাগুলো কোলকাতাকেন্দ্রিক মূল রূপকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সীমারেখাভুক্ত উপভাষাগুলো রাজধানী ঢাকাকেন্দ্রিক প্রধান রূপের ওপর নির্ভরশীল ভিন্নরূপে বিকাশমান, যা তাদের ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া, শব্দ-নির্মাণ ইত্যাদিতে প্রতিফলিত হচ্ছে।[২] উদাহরণস্বরূপ, কলকাতার প্রশাসন কর্তৃক 'corporation', 'foreign minister' ইত্যাদি শব্দের বাংলা হিসেবে যথাক্রমে 'নিগম' ও 'বিদেশমন্ত্রী' নিঃসন্দেহে কোলকাতাকেন্দ্রিক অন্যান্য বাংলা উপভাষায়ও ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যদিকে এদের ঢাকা কর্তৃক চয়নকৃত রূপ যেমন 'কর্পোরেশন', 'পররাষ্ট্রমন্ত্রী'ও ঢাকা কেন্দ্রিক বাংলা উপভাষাসমূহে সাদরে গৃহীত হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, রাজনৈতিক বিভাজনের কারণে বর্তমানে বাংলার দুটি কেন্দ্ররূপতা বা স্বয়ংরূপতা সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়টি নিম্নোক্ত চিত্রে রূপায়িত করা যায়।

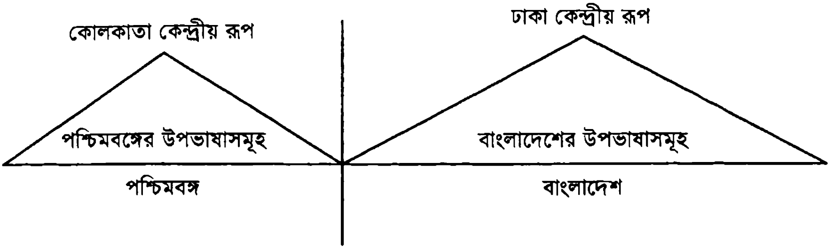

চিত্র-২ : বাংলা ভাষার দ্বি-কেন্দ্রিকতার ছক

তবে এটাও স্মর্তব্য যে, কোলকাতাকেন্দ্রিক ও ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা ভাষার রূপগুলো এখনও ডাচ ও মূল জার্মান ভাষার মতো স্বাধীন স্বয়ংরূপে (complete autonomy) পরিণত হয়নি।

১.২.৩ সামাজিক উপভাষা-ধারাবাহিকতা

চেম্বার্স ও ট্রাডগিলের (১৯৯৮) মতে, ভাষার অঞ্চলগত বিন্যাসের পাশাপাশি এর সামাজিক স্তরবিন্যাসপ্রসূত ধারাবাহিকতাও লক্ষণীয়। শ্রেণিবিভক্ত সামাজিক কাঠামোয় অর্থ, কুলমহিমা, পেশা, বয়স ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যে আনুভূমিক স্তরবিন্যাসের জন্ম লাভ ঘটছে তাতে একটি ভাষার বিভিন্ন সামাজিক রূপ ও রূপান্তর উদ্ভূত ধারাবাহিকতাও প্রকট। ঢাকা শহরের বর্তমান ভাষা পরিস্থিতির ওপর আলোকপাতের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। ১৯৪৭-পূর্ববর্তী সময়ে ঢাকা শহরে আর্থিক স্তরবিন্যাসপ্রসূত সামাজিক কাঠামোয় দুই ধরনের ভাষারীতি প্রচলিত ছিল। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি তখন কোলকাতাকেন্দ্রিক প্রমিত বাংলা রূপ ব্যবহার করত। আর নিম্নবিত্ত শ্রেণি ঢাকার স্থানীয় রূপে সংজ্ঞাপন ক্রিয়া চালাত। কিন্তু বিশ শতকের এই দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে ঢাকায় এক জটিল ভাষারীতির জন্ম হয়, যা প্রকৃতপক্ষে ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলার সামাজিক উপভাষা-ধারাবাহিকতার সূচনা ঘটায়। কেননা ঢাকায় বর্তমানে কোলকাতাকেন্দ্রিক প্রমিত রূপের সঙ্গে এর স্থানীয় ভাষারীতির জটিল মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে এক নতুন ক্রেওল* ভাষারীতির সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে বর্তমানে ঢাকা শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও বয়স্করা প্রমিত বাংলা ব্যবহার করে, অন্যদিকে তরুণ সমাজ ও উদারপন্থীরা ক্রেওল ভাষারীতি প্রয়োগ করে। আর নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবীরা তাদের নিজস্ব উপভাষাতেই ভাব-বিনিময় করে। এ বিষয়টিকে চেম্বার্স ও ট্রাডগিল (১৯৯৮) অনুসরণে নিম্নোক্তভাবে ছকবদ্ধ করা যেতে পারে।

উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ———————— প্রমিত রূপ

নিম্নবিত্ত ———————————— উপভাষা

চিত্র-৩ ক : ঢাকার ভাষিক পরিস্থিতি (১৯৪৭-পূর্ববর্তী)

---

* ক্রেওল :

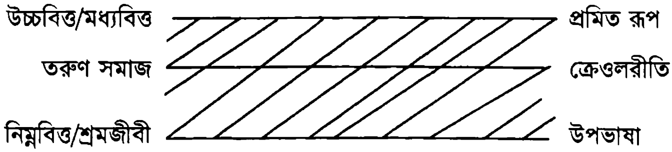

চিত্র ৩ খ : ঢাকার ভাষিক পরিস্থিতি (বর্তমান)

১.৩ উপভাষাতত্ত্ব : যাত্রা যেভাবে শুরু

ভাষাসংক্রান্ত গবেষণা ও এর বিভিন্ন উপাদানের অন্তর্নিহিত স্বরূপ উন্মোচন মানব সভ্যতার জ্ঞানচর্চার প্রারম্ভিক পর্ব থেকেই শুরু হলেও উপভাষাকেন্দ্রিক আনুষ্ঠানিক গবেষণার সূত্রপাত হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ইউরোপে। এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ব্যক্তিটি হচ্ছেন জার্মান ভাষা-গবেষক গিয়র্গ ভেনকার (১৮৫২-১৯১১) যাঁকে এ শাস্ত্রের অন্যতম প্রবর্তকের সম্মানে ভূষিত করা হয়ে থাকে। কেননা তাঁর হাত ধরেই আধুনিক উপভাষাতত্ত্বের পূর্ববর্তী ধাপ উপভাষা ভূগোলের (dialect geography) যাত্রা শুরু হয়েছে। ভেনকার জার্মান উপভাষা-সমূহের মানচিত্র তৈরির লক্ষ্যে ১৮৭৬ সালে প্রথম ভাষা জরিপ ও ক্ষেত্র-গবেষণার (field research) কাজ শুরু করেন। এ লক্ষ্যে তিনি প্রথম দিকে দক্ষিণ জার্মানির স্কুল শিক্ষকদের কাছে প্রমিত জার্মানে লিখিত কিছু বাক্যের তালিকাসহযোগে একটি চিঠি প্রেরণ করেন এবং তাদের অনুরোধ করেন এই বাক্যগুলো তাঁদের স্থানীয় ভাষারীতিতে লিখে ফেরত পাঠানোর জন্য। যে সরল বাক্য দিয়ে তাঁর প্রশ্নমালা শুরু হয়েছিল সেটি হচ্ছে — Im winter fliegen die trocknen Blatter durch die Luft herum [শীতকালে গাছের শুষ্ক পাতাগুলো বাতাসে উড়তে শুরু করল]। ভেনকার পরবর্তীকালে তাঁর কাজের ক্ষেত্র সমগ্র জার্মানিতে সম্প্রসারিত করেন এবং ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) স্কুল শিক্ষকের কাছে এ চিঠি প্রেরণ করে ৪৫,০০০ পূরণকৃত উত্তরপত্র ফেরত পান। কিন্তু প্রাপ্ত উপাত্তের অতি প্রাচুর্যের কারণে এ গবেষণাকর্মে তিনি হতোদ্যম হয়ে পড়েন। ফলে তিনি তাঁর গবেষণাকর্মটি শুধু কিছু শব্দের এলাকাভিত্তিক বৈচিত্র্যের ধরন বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে মনস্থির করেন। এ ছাড়া সে সময়ে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে প্রস্তুতকৃত উপভাষা মানচিত্র কীভাবে প্রকাশিত হবে তা ভেবেও তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু এতসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি প্রাপ্ত উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে হাতে লিখে দুই সেট জার্মান উপভাষা মানচিত্র প্রস্তুত করেন, যার প্রত্যেকটি উত্তর ও মধ্য জার্মানির উপভাষাসমূহের একটি ফিচারকে রূপায়িত করেছে। পরে তাঁর প্রস্তুতকৃত উপভাষা মানচিত্র Sprachatlas des Deutschen Reichs শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই মানচিত্রের একটি করে কপি মারবুর্গ ও বার্লিন শহরে ১৮৮১ সাল থেকে সংরক্ষিত আছে। উল্লেখ্য, ভেনকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এই উপভাষা মানচিত্রটিই পৃথিবীতে প্রথম প্রকাশিত ভাষিক মানচিত্র। ভেনকারকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ১৮৯৮ সালে মারিয়াস ক্রিস্টেনসেনের নেতৃত্বে ডেনিশ উপভাষাসমূহের মানচিত্র নির্মাণের জন্য ডেনমার্কে সীমিত আকারে আরেকটি প্রকল্প শুরু হয়, যেটি প্রায় ১৫ বছর পর ১৯১২ সালে সম্পন্ন হয় (চেম্বার্স ও

ট্রাডগিল, ১৯৯৮)। এ প্রসঙ্গে আমরা জন আব্রাহম গ্রিয়ারসন (১৮৫১-১৯৪১) কর্তৃক পরিচালিত ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার উপভাষাসমূহের জরিপকর্মের কথা উল্লেখ করতে পারি যেটি ১৮৯৮ সালে ভেনকারের অনুসৃত পদ্ধতি অবলম্বনে শুরু হয়। গ্রিয়ারসনের এই গবেষণকর্মের ফলাফল তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি *Linguistic Survey of India*-তে সংকলিত হয়েছে (আরিফ, ২০০৩)। ভেনকারের সমসাময়িক গ্রিয়ারসন তাঁর গবেষণাকর্মে ভেনকার অনুসৃত পদ্ধতি অনুসরণ করলেও তাঁদের দুজনের মধ্যে এ সংক্রান্ত কোনো আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ হয়েছে কিনা এ বিষয়ে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়নি।

ভেনকার ও গ্রিয়ারসনের প্রায় সমসাময়িক সুইস পরিচালক জুল গিলেঁর ১৮৯৬ সালে ফরাসি ভাষার উপভাষাসমূহ জরিপের জন্য একটি গবেষণাকর্ম শুরু করেন (চেম্বার্স ও ট্রাডগিল, ১৯৯৮)। এই গবেষণাকর্মে তিনি শুধু ভেনকার অনুসৃত পদ্ধতির উন্নত সংস্করণই ব্যবহার করেননি বরং ধ্বনিতাত্ত্বিক সফলতা লাভের জন্য গিলেঁর এই প্রথম এডমন্ড এডমন্ট নামক একজন প্রশিক্ষিত জরিপকর্মী নিয়োগ দান করেন। এডমন্ট, যিনি পেশায় ছিলেন মুদি দোকানদার, উপভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে একজন কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তিত্ব। কেননা, তিনি তাঁর শ্রবণশক্তির তীক্ষ্ণতা গুণের জন্য উপভাষাসমূহের ধ্বনিমূলের সঠিক প্রতীক ব্যবহারে (phonetic notation) দক্ষতা লাভ করেছিলেন। এডমন্ট ১৮৯৬ থেকে ১৯০০ — এই চার বছর সমগ্র ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চল ঘুরে ৬৩৯ স্থান থেকে ৭০০ জন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। পরে এডমন্ট তাঁর গৃহীত সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য গিলেঁরের কাছে নিয়মিত পাঠাতেন, যেগুলি তাঁর প্রশিক্ষিত সহকারীরা বিশ্লেষণ করে যে ফলাফল পেতেন তা নিয়মিত প্রকাশ করা হতো। এভাবে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে গিলেঁর ১৯০২ - ১৯১০ কালপর্বে ১৩ খণ্ডে তাঁর গবেষণাকর্মের সার্বিক ফলাফল প্রকাশ করেন।

'উপভাষা ভূগোল' চর্চার প্রারম্ভিক যুগের যে সংক্ষিপ্ত সারাৎসার ওপরে উপস্থাপিত হলো, তার অন্তরালে তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক বিবেচনা কার্যকর রয়েছে। এই তাত্ত্বিক ধারণাটি হচ্ছে, ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন সংক্রান্ত নব্য ব্যাকরণবিদদের গবেষণাপ্রসূত অর্জন, যেটি প্রখ্যাত দুই নব্য ব্যাকরণবিদ ব্রুগমান ও অশ্‌ট্‌হফ-এর ঘোষণায় ব্যক্ত হয় এভাবে যে, 'ধ্বনিপরিবর্তন ব্যতিক্রমরহিত', অথবা আজাদের অনুবাদে উচ্চারিত হয় যে, 'সমস্ত ধ্বনিপরিবর্তন, যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়, সূত্রানুসারে সংঘটিত হয়, যার কোন ব্যতিক্রম নেই' (আজাদ, ১৯৯৮ : ৪৩)। ইউরোপে উপভাষা ভূগোল চর্চার সূচনালগ্নে জার্মান নব্য ব্যাকরণবিদরা তাঁদের এই যুগান্তকারী তত্ত্ব প্রকাশ করেন যা প্রকারান্তরে প্রথমদিককার উপভাষা-ভূগোলবিদদের নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছে। ফলে উপভাষা-ভূগোলবিদরাও উদ্যোগী হয়েছেন উপভাষাসমূহের অন্তর্নিহিত কাঠামোতে নব্য ব্যাকরণবিদদের ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রের যাথার্থ্য অনুসন্ধানে। প্রকৃতপক্ষে নব্য ব্যাকরণবিদদের তত্ত্বাশ্রিত উপভাষা গবেষণা যা 'উপভাষা-ভূগোল' নামে সমধিক পরিচিত, তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে উপভাষাসমূহের বিদ্যমান অন্তর্গত পার্থক্যসমূহ, যা ধ্বনি ও রূপমূলে পরিদৃষ্ট হয়, সেগুলোর নিয়মতান্ত্রিক ও প্রণালিবদ্ধ বিশ্লেষণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি উদ্ভাবন করা। সর্বোপরি, উপরিউক্ত তাত্ত্বিক অভিব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ বিশ্লেষণধর্মিতার জন্যই উপভাষা-ভূগোলকে সাধারণভাবে 'উপভাষাতত্ত্ব' নামে অভিহিত করা হয় (চেম্বার্স ট্রাডগিল,

১৯৯৮), যদিও বর্তমানে শাস্ত্র হিসেবে উপভাষাতত্ত্বের আওতা ও পরিসর অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৪ উপভাষা-ভূগোল ও ভাষাবিজ্ঞানের সম্মিলন : নতুন দিগন্তের দরোজা

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে ইউরোপে উপভাষা-ভূগোল চর্চায় নব্য ব্যাকরণবিদদের গৃহীত তত্ত্ব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এর সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানের বিশেষ করে ফিলোলজির এক সম্মিলন সংঘটিত হয়। আর এই সম্মিলনই পরবর্তীকালে উপভাষাতত্ত্বের সঙ্গে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান ও সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানের মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। মূলত এই সম্মিলন ও মিথস্ক্রিয়া উপভাষাতত্ত্বে নিম্নোক্ত তিনটি পৃথক শ্রেণি বিভাগের জন্ম দিয়েছে।

১.৪.১. ফিলোলজিক্যাল উপভাষাতত্ত্ব

উপভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাসে ফিলোলজিক্যাল বা প্রথাগত উপভাষাতত্ত্ব শুধু দীর্ঘ সময় ধরে চর্চিত উপভাষাতত্ত্বের বিশেষ ধারাক্রম নয়, বরং এ ধারাকে কেন্দ্র করেই উপভাষাতত্ত্ব চর্চার যাত্রা শুরু। যেহেতু এ ধারার প্রতিনিধিত্বকারী উপভাষাতাত্ত্বিকরা নব্য ব্যাকরণবিদদের ঘোষিত 'ধ্বনিপরিবর্তন ব্যতিক্রমরহিত' তত্ত্বে প্রভাবিত ছিলেন, সেহেতু তাঁরা বিভিন্ন ভাষার উপভাষা রূপের ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যেও তার প্রতিফলন দেখতে চেয়েছেন। ফলে তাঁরা এ ধারণায় স্থিতধী ছিলেন যে, একটি ভাষার বিভিন্ন উপভাষার ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া নিয়মিত ও ব্যতিক্রমরহিত। পাশাপাশি তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন যে, কোনো ভাষার একটি নির্দিষ্ট উপভাষায় যে ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে, ঐ ভাষার অন্য একটি উপভাষায়ও অনুরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। কিন্তু তাঁদের এই অনুমান সর্বক্ষেত্রে ফলদায়ক হয়নি। যেমন, জার্মান বংশ থেকে উদ্ভূত ভাষাসমূহে একই রকম ধ্বনি পরিবর্তন লক্ষণীয় নয়। এ ভাষাবংশের আধুনিক জার্মান ভাষায় শব্দের আদিতে / ট / ধ্বনি /ৎস / ধ্বনি পরিবর্তিত হলেও এর অন্য সদস্য ইংরেজিতে এমন পরিবর্তন দুর্লক্ষ্য (চেম্বার্স ও ট্রাডগিল, ১৯৯৮)। অন্যদিকে পেটিট (১৯৮০) জানাচ্ছেন যে, ভেনকার (১৮৭৬)-এর জার্মান ভাষা জরিপে যে জটিল ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার চিত্র ফুটে উঠেছে তা নব্য ব্যাকরণবিদদের চিন্তাপ্রসূত অনুমিত সিদ্ধান্তের চেয়ে পৃথক। এ পরিস্থিতিতে উপভাষা-তাত্ত্বিকরা উপভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত সূত্র উন্মোচনের জন্য উপভাষাতত্ত্বের সঙ্গে নতুন ভাষাচিন্তার সংযোগ ঘটিয়ে যে নতুন শাখার উদ্ভব ঘটালেন তার নাম সাংগঠনিক উপভাষাতত্ত্ব।

১.৪.২. সাংগঠনিক উপভাষাতত্ত্ব

উপভাষা বিশ্লেষণে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রয়োগ উপভাষাতত্ত্বে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সর্বব্যাপী প্রভাবকে নির্দেশ করে। মূলত ফিলোলজিক্যাল বা প্রথাগত উপভাষাতত্ত্বে উপভাষার ধ্বনি পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে না পারার যে সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয় তার প্রতিবিধানের জন্যই সাংগঠনিক তত্ত্বাদি প্রয়োগের সম্ভাবনা দাঁড়িয়ে যায়। তত্ত্বগতভাবে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান যেমন কোনো ভাষার এককালীন কাঠামোর প্রণালিবদ্ধ বিশ্লেষণ করে থাকে, সাংগঠনিক উপভাষাতত্ত্বও তেমনি উপভাষার উপাদানসমূহকে একটি সংশ্রয় বা

সংগঠনের অনিবার্য অংশ বলে মনে করে, যেটি ছিল প্রথাগত উপভাষাতত্ত্বের মূল সীমাবদ্ধতা (চেম্বার্স ও ট্রাডগিল, ১৯৯৮)। কেননা, প্রথাগত উপভাষাতাত্ত্বিকরা উপভাষা বিশ্লেষণে উপভাষার কোনো উপাদানকে ঐ উপভাষার অন্তর্নিহিত সংগঠন বা সিস্টেমের অংশ মনে না করে বিচ্ছিন্ন উপাদান হিসেবে ভাবতেন। ফলে তাঁরা উপভাষার বিভিন্ন রূপ-রীতির অন্তর্গত চারিত্র্য উন্মোচনে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করেননি। মূলত এসব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার উপভাষা গবেষণায় ব্যাপকভাবে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও প্রণালি প্রয়োগ শুরু হয়। যেসব নীতিমালা ও প্রণালি পদ্ধতি অনুসরণ করে সাংগঠনিক উপভাষাতাত্ত্বিকরা ভাষা গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করেন, চেম্বার্স ও ট্রাডগিল (১৯৯৮) এবং মৌলটন (১৯৬০)-এর অনুসরণে, নিম্নে তার সারাৎসার তুলে ধরা হলো :

১. উপভাষার বিভিন্ন রূপ সংগ্রহে উপভাষা ক্ষেত্র-পদ্ধতি (dialectological fieldwork) ব্যাপকভাবে অনুসরণ করা হয়।

২. উপভাষাতাত্ত্বিকরা কোনো নির্দিষ্ট উপভাষারূপের বিশেষ উপাদান, বিশেষ করে, ধ্বনিতাত্ত্বিক গবেষণায় শুধু খণ্ডতাবাদী ধ্বনিগত প্রতিবর্ণীকরণে (atomistic phonetic transcription) নির্ভরশীল না হয়ে এর অন্তর্লীন সংগঠন কাঠামোর ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকেন।

৩. ধ্বনিমূল বিশ্লেষণে তাঁরা সংশ্লিষ্ট উপভাষার তথ্যদাতার উত্তর থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে দুটি শব্দ-জোড়ের ধ্বনিগত বৈপরীত্য, মুক্ত বৈচিত্র্য বা পরিপূরক বণ্টন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন।

৪. কোনো নির্দিষ্ট উপভাষার কল্পিত সমধ্বনি রেখা (isophone line) অঙ্কনের ক্ষেত্রে উপভাষাতাত্ত্বিকরা সংশ্লিষ্ট ধ্বনিরূপগুলোর পরস্পর সাদৃশ্য বিচার না করে বরং ঐ রূপের অন্তর্গত ধ্বনি সংগঠন বা সিস্টেমের ওপর জোর দিয়ে থাকেন। পাশাপাশি ঐ উপভাষার সমগণ্ডিরেখা বা সমরূপরেখা নির্মাণের ক্ষেত্রেও এই অভিন্ন নীতি অনুসরণ করে থাকেন।

উপভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে সাংগঠনিক উপভাষাতত্ত্বের যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৪ সালে, যখন ইউরিয়েল ভাইনরাইখ (১৯২৬-১৯৬৭) 'Is a structural dialectology possible?' শিরোনামে *Word* জার্নালে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই বিখ্যাত প্রবন্ধের শুরুতেই ভাইনরাইখ সোস্যুরের সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যসমূহের চৌম্বকধর্মী বর্ণনা দেন। তারপর উপভাষা চর্চার ক্ষেত্রে শাস্ত্র হিসেবে সাংগঠনিক উপভাষাতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি প্রথমেই প্রথাগত উপভাষাতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করেন এই বলে যে, এ শাস্ত্রটি একটি ভাষার দুটি উপভাষার ধ্বনির বৈশিষ্ট্য উন্মোচনে এদের রূপগত বৈচিত্র্যের অন্তর্নিহিত সংগঠনকে উপেক্ষা করে। এছাড়া তাঁর বিবেচনায় প্রথাগত উপভাষাতত্ত্ব দুটি পৃথক ঔপভাষিক ভ্যারাইটির বিভিন্ন ভাষিক উপাদানের তুলনা করে ঐ সিস্টেমের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যসমূহের সহজাত সম্পর্কের ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ না করে। ভাইনরাইখের নিজের কথায়—

> The main objection raised by the structuralists against dialectology... in constructing 'diasystems' it ignores the structures of the constituent varieties. In other words, existing dialectology usually compare elements

> belonging to two different systems without sufficiently stressing their innate member in those systems. [Weinreich, 1954 : 391]

প্রথাগত উপভাষাতত্ত্বের উপরিউক্ত সীমাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ভাইনরাইখ (১৯৫৪) তাঁর প্রবন্ধে প্রস্তাব করেন সাংগঠনিক উপভাষাতত্ত্বের এবং সন্নিবেশিত করেন এ শাস্ত্রের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য ও চারিত্র্যসমূহ :

> ক. আংশিক সাদৃশ্যজনিত কারণে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপভাষার নৈকট্যপ্রাপ্ত দুই বা ততোধিক রূপের মধ্যেকার উদ্ভূত সমস্যাসমূহ উপভাষাতত্ত্বের উপজীব্য বিষয় হিসাবে প্রাধান্য পাবে।
>
> খ. বিশেষ করে, উপভাষাতত্ত্ব আংশিক সাদৃশ্যসম্পৃক্ত কার্যকাঠামোতে উদ্ভূত কোনো ভাষার বিভিন্ন উপভাষার একাধিক রূপের আংশিক বৈপরীত্যের সাংগঠনিক তাৎপর্যসমূহ অন্বেষণ করবে।
>
> গ. উপভাষাতত্ত্ব অতীতের মতো শুধু ঐতিহাসিক বা কালানুক্রমিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত কোনো উপভাষার দুই ভিন্ন সময়ের ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়াকেই বিশ্লেষণ করবে না, বরং এর সমকালীন বা এককালীন রূপের পরিবর্তমান প্রক্রিয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করবে।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায় যে, ভাইনরাইখের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক উপভাষাতত্ত্ব মূলত এককালীন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে কোনো ভাষার দুটি উপভাষা ভ্যারাইটির আংশিক সাদৃশ্যপূর্ণ উপাদান তথা ধ্বনি বা ধ্বনির পরিবর্তনজাত রূপের আংশিক বৈপরীত্যের সাংগঠনিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে। ভাইনরাইখ বলেন :

> Dialectology would be the investigation of problems arising when different systems are treated together because of their partial similarity. A specifically structural diatectology would look for the structural consequences of partial differences within a framework of partial similarity. [Weineich, 1954 : 390]

ভাইনরাইখ তাঁর প্রস্তাবিত সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপভাষার দুটি ভ্যারাইটির আংশিক সাদৃশ্যজাত উপাদানের আপাত পার্থক্যের সাংগঠনিক বিশ্লেষণে যে ছকবদ্ধ কার্যপ্রণালি বা সূত্র উপস্থাপন করেন তাকে বলা হয় দ্বিরীতিসংশ্রয় (diasystem)। এই দ্বিরীতিসংশ্রয় কোনো ভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন উপভাষার আপাত বিচ্ছিন্ন ভ্যারাইটিসমূহকে একই ভাষিক ধারাবাহিকতার সদস্য হিসেবে বিবেচনার পাশাপাশি এদের বিভিন্ন উপাদানের অভিন্ন সাংগঠনিক বর্ণনা প্রদান করে থাকে। বস্তুত এই দ্বিরীতিসংশ্রয় একটি উচ্চস্তরীয় সাংগঠনিক পদ্ধতি বা কৌশল যেটি শুধু একাধিক উপভাষা ভ্যারাইটিকে একত্র করে না, বরং তাদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপও উন্মোচন করে। সর্বোপরি, দ্বিরীতিসংশ্রয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি ভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন উপভাষার যে সাংগঠনিক রূপের প্রতিফলন ঘটে, তাতে ঐ ভাষার সংশ্লিষ্ট রূপের অন্তঃকাঠামো সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করা যায়।

ভাইনরাইখের সাংগঠনিক উপভাষাতত্ত্বের ইশতেহারসংবলিত উপরিউক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের পরপরই পশ্চিমে এ তত্ত্ব প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ফলে ঐ অঞ্চলে উক্ত

তাত্ত্বিক ভিত্তিকে মানক ধরে শুরু হয় ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার উপভাষা বিশ্লেষণের কাজ। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন উইলিয়াম মৌলটন যিনি সুইজারল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলীয় জার্মান উপভাষার সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনি পদ্ধতি বিষয়ে একটি গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেন এবং ১৯৬০ সালে 'The short vowel systems of northern Switzerland : a study in structural dialectology' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ নিউইয়র্ক ভাষাতাত্ত্বিক সার্কেল কর্তৃক প্রকাশিত *Word* জার্নালে প্রকাশ করেন।

১.৪.৩. সৃষ্টিশীল উপভাষাতত্ত্ব

সৃষ্টিশীল উপভাষাতত্ত্ব উপভাষা বিশ্লেষণে সৃষ্টিশীল ধ্বনিতত্ত্বের তত্ত্বপ্রণালি ও সূত্রাদি প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। মূলত উপভাষার ধ্বনি বিশ্লেষণে সাংগঠনিক উপভাষাতত্ত্বের নিম্নোক্ত সীমাবদ্ধতার কারণে সাম্প্রতিক কালে সৃষ্টিশীল উপভাষাতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে (চেম্বার্স ও ট্রাডগিল, ১৯৯৮)। কোনো ভাষায় ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য সাধারণত তিন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় — ধ্বনিমূল তালিকায় (phoneme inventory), শব্দের বিভিন্ন অবস্থানে ধ্বনির বন্টনে (phoneme distribution) ও শব্দে ধ্বনি-আপতনে (phoneme incidence)। একটি ভাষার ধ্বনিমূল তালিকার নির্দিষ্ট ধ্বনিমূল বিশেষ উপভাষা ভ্যারাইটিতে পাওয়া নাও যেতে পারে, অথবা অন্য উপভাষায় ধ্বনিমূল তালিকার অতিরিক্ত ধ্বনি দৃষ্টিগোচর হতে পারে। মূল ভাষার ধ্বনিমূল তালিকার সঙ্গে গোচরীভূত এই পার্থক্যটি সহজেই সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের বহুল ব্যবহৃত দ্বিরীতিসংশ্রয় প্রক্রিয়া সৃজনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য অবলোকনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র শব্দে ধ্বনির বণ্টন। এর ব্যাখ্যা হলো ধ্বনিমূল তালিকার বিভিন্ন ধ্বনি শব্দে ব্যবহারের সময় ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতিবেশ মেনে চলে। ফলে শব্দের সুনির্দিষ্ট প্রতিবেশে বণ্টন অনুসারে ধ্বনির উচ্চারণে রকমফের পরিলক্ষিত হয়। এ রকম ধ্বনি পরিবর্তনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো /র/এর প্রতিবেশগত উচ্চারণ। এই /র/ ধ্বনিটি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষত ইংরেজি ভাষা অধ্যুষিত অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়। /র/ ধ্বনির এই উচ্চারণ-ভিন্নতার মূলে রয়েছে শব্দের বিভিন্ন প্রতিবেশে এর ব্যবহার। /র/ ধ্বনির এই জটিল পরিবর্তনের ব্যাপারটি সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের দ্বিরীতিসংশ্রয় সৃজনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। মূলত 'দ্বিরীতিসংশ্রয়' প্রক্রিয়াটি উপভাষার স্বরধ্বনিসমূহের পরিবর্তনকে সহজে ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনির বিভিন্ন ধ্বনিমূলের শব্দে প্রতিবেশজনিত বণ্টনে বিশেষ করে অক্ষর সংগঠনের বিভিন্ন অবস্থানে সংঘটিত পরিবর্তন প্রক্রিয়া সমৃদ্ধ দ্বিরীতিসংশ্রয় সৃজন এক অতি জটিল ও প্রায় অসাধ্য প্রচেষ্টা।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য বা বৈপরীত্য পর্যবেক্ষণের সর্বশেষ ক্ষেত্র হলো শব্দের ধ্বনির আপতন বা আকস্মিক সংঘটন। একটি ভাষার কোনো উপভাষার কিছু ধ্বনির অস্তিত্ব ঐ ভাষার ধ্বনিমূল তালিকা দ্বারা ব্যাখ্যাযোগ্য হলেও এগুলোর অবস্থান ও পরিবর্তন প্রক্রিয়া এত আকস্মিক ও অনন্যসাধারণ যে এদের ধ্বনি পরিবর্তনের প্রকৃতি বা সাংগঠনিক অন্তর প্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্য কোনো সহজ দ্বিরীতিসংশ্রয় সৃজন লক্ষ্যযোগ্য নয়।

ভাষার ধ্বনির অন্তর্নিহিত পরিবর্তন বিশ্লেষণে সাংগঠনিক উপভাষাতত্ত্বের উপরিউক্ত সীমাবদ্ধতার কারণে অতি সম্প্রতি সৃষ্টিশীল উপভাষাতত্ত্ব নামক যে নতুন ধারার বিশ্লেষণরীতির জন্ম হয়েছে তা মূলত দুটি নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত (চেম্বার্স ও ট্রাডগিল, ১৯৯৮)। সৃষ্টিশীল উপভাষাতত্ত্ব ধরে নেয় যে, (ক) ধ্বনির একটি অন্তর্নিহিত মানসিক রূপ আছে যাতে ভাষার শাব্দিক প্রকরণগুলো সংগুপ্ত থাকে এবং (খ) ধ্বনির বিভিন্ন ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম-পদ্ধতি পূর্বোক্ত অন্তর্নিহিত রূপকে ভূমিস্তরে নিয়ে আসে যা প্রকারান্তরে মানুষকে সেসব ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ উচ্চারণ করতে সহায়তা করে। মূলত এই দুটি তাৎপর্যপূর্ণ মূলনীতির ওপর স্থিতধী সৃষ্টিশীল উপভাষাতত্ত্ব এ ধারণা ব্যক্ত করে যে, ভাষার বিভিন্ন উপভাষা ভ্যারাইটির জন্য একটি অন্তর্নিহিত রূপ সংগঠন রয়েছে। এ অভ্যন্তরীণ সংগঠনটি এ সমস্ত উপভাষার বহিঃস্তরের (১) ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম, (২) বিভিন্ন প্রতিবেশ, যাতে এ নিয়মগুলো প্রযুক্ত হয় এবং (৩) বিভিন্ন সামাজিক ক্রমধারা, যার দ্বারা ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মগুলো প্রভাবিত হয় এবং কারণে ভিন্ন ভিন্ন উপভাষায় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন চিত্র ৫)। এ প্রসঙ্গে চেম্বার্স ও ট্রাডগিল বলেন,

> Generative dialectology worked on the assumption that a single underlying form can be postulated for related dialect and these diatects differ in (a) the phonological rules that apply to the underlying forms, and/or (b) the environments in which the rules apply, and /or (c) the order in which the rules apply. [Chambers & Trudgill, 1998]

২. বাংলা উপভাষা চর্চা : ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ও বর্তমান প্রবণতা

২.১ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত

পশ্চিমের মতো বাংলাভাষী অঞ্চলেও ভাষার স্থানিক রূপটিই 'উপভাষা' ধারণার ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এক্ষেত্রে স্থানিক রূপটি অর্থাৎ বাংলা ভাষা-মণ্ডলের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষিকরূপের কী কী পরিবর্তন, সংযোজন ও পরিমার্জন সাধিত হয়েছে তাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। বিগত প্রায় ২৫০ বছরের বাংলা উপভাষা চর্চায় সে সুরটিই প্রকট। রফিকুল ইসলাম জানাচ্ছেন যে —

> পর্তুগীজ ধর্মযাজক মানো এল দ্য আসসুম্পসাঁও ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে 'ভোকাবুলারিও এম. ইদিওমা বেনগাল্লা এ পর্তুগীজ' নামক বাংলাভাষার যে প্রথম ব্যাকরণটি ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণায় বসে রচনা করেছিলেন তাতে ভাওয়াল অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৭৩৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত উক্ত লেখকের 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থেও ভাওয়ালের উপভাষা ব্যবহৃত হয়। (ইসলাম, ১৯৯৮ : ৭৫)

অর্থাৎ ইসলামের (১৯৯৮) মতে, মানোএল দ্য আসসুম্পসাঁও-এর রচনায় বাংলা উপভাষার প্রথম ব্যবহার লক্ষণীয়। তারপর উইলিয়ম কেরী রচিত *কথোপকথন* (১৮০১) গ্রন্থেও যেহেতু বাংলাভাষী বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল, তাই এটিকেও বাংলা উপভাষা গ্রন্থবদ্ধ করার প্রাথমিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা যেতে পারে। উইলিয়ম কেরীর প্রায় ১০০ বছর পরে জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন ১৯০৩ থেকে ১৯২৮ সালে প্রকাশিত

Linguistic Survey of India-র মোট ১১ খণ্ডে জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্ত থেকে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার উপভাষাসমূহের যে শ্রেণিকরণ করেছেন তা বাংলা উপভাষা চর্চার ক্ষেত্রেও মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। কেননা এ গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের প্রথম ভাগে তিনি বাংলা ভাষার বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষিক রূপের বর্ণনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের পাশাপাশি এদের শ্রেণিকরণ করেছেন। তাঁর অনুসৃত শ্রেণীকরণই পরবর্তীকালে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুকুমার সেন, পরেশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়ে বাংলা উপভাষার প্রধান শ্রেণিকরণরূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। উল্লেখ্য, গ্রিয়ারসনকৃত শ্রেণিকরণে উত্তরবঙ্গীয় (দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা), রাজবংশী (রংপুর) ও পূর্ববঙ্গীয় (ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, বরিশাল, পটুয়াখালি, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি) অঞ্চল বর্তমান বাংলাদেশের মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত।

২.২. বাংলা উপভাষা ও এদের গাঠনিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

মুনীর চৌধুরী (১৯৬০) তাঁর 'The language problem in East Pakistan' প্রবন্ধে (রফিকুল ইসলাম, ১৯৯৮ ও মনিরুজ্জামান, ১৯৯৪ হতে সংগৃহীত) গ্রিয়ারসন অনুসরণে বাংলাদেশের উপভাষার যে প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করেছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

ক. ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

১. তাড়নজাত মূর্ধন্য ব্যঞ্জন 'ড়' স্থানে দন্ত্য 'র', যথা বড় > বর।

২. তাড়নজাত দন্ত্য 'র' স্থানে পার্শ্বিক 'ল', যেমন শরীর > শরীল।

৩. রাজশাহী অঞ্চলে উষ্ম তালব্য 'শ' ও উষ্ম দন্ত্য 'স' ধ্বনির মধ্যে বিভ্রান্তি।

৪. সম্মুখ প্রসৃত উচ্চমধ্য 'এ' ও নিম্নমধ্য 'এ্যা' ধ্বনি এবং গোলাকৃতি নিম্নমধ্য 'অ' ও উচ্চমধ্য 'ও' ধ্বনির মধ্যে বিভ্রান্তি।

৫. পূর্ববঙ্গীয়তে স্পৃষ্ট তালব্য ব্যঞ্জন 'চ' 'ছ' 'জ' 'ঝ'-এর পরিবর্তে ঘৃষ্ট বা উষ্ম 'ছ' ও 'য' ধ্বনি পাওয়া যায়।

৬. অল্পপ্রাণ 'ক' এবং মহাপ্রাণ 'খ' মধ্য অবস্থানে উষ্ম কণ্ঠ 'হ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়, আদি অবস্থানে 'হ' ধ্বনি উহ্য থাকে।

খ. রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

১. উত্তরবঙ্গীয়তে কর্তার বহুবচনে 'তে' বিভক্তি (ছাওতে), কর্মে 'দেক' (চাকরদেক), গোণ কর্মে 'গুণে' (আমাক গুণে), অপদানে 'ত' (দেশত) ইত্যাদি।

২. রাজবংশীতে কর্তায় বহুবচনে 'গুলা' 'গিলা' (বালকগুলা), সম্বন্ধের বহুবচনে 'এর' (চাকরের ঘর), অপাদানে 'অত' (বালকত) ইত্যাদি।

৩. ক্রিয়াপদের রূপ : প্রথম পুরুষ ভবিষ্যৎ 'মু' (কমু'), ময়মনসিংহে 'আম' (করবাম), অসমাপিকাতে 'আ', ইয়া' (করিয়া, কইরা), কুমিল্লায় অনির্দেশক 'তো' 'তাম' (করতো), রাজবংশীয়তে অতীতে 'নু' (আছিনু), ভবিষ্যতে 'মু' (থাকিমু), সম্বন্ধের বহুবচনে 'গো' (তাগো), চট্টগ্রামে কর্তায় 'এ', অপাদানে 'তুন' সম্বন্ধে 'অর' অপাদানে 'অত' ইত্যাদি।

গ্রিয়ারসন ও পরবর্তীকালে অন্যদের দ্বারা স্থিরীকৃত বাংলাদেশের উপভাষাসমূহের সাধারণ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে — অপিনিহিতির ব্যবহার, মহাপ্রাণতার অপস্রয়ণ ও আনুনাসিকতার বিলোপ ইত্যাদি। এছাড়া রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রধান হচ্ছে, সর্বনামে 'আমি' উপভাষা উত্তরবঙ্গে 'মুই', নোয়াখালিতে 'আই', 'আমার' উত্তরবঙ্গে 'মোর', নোয়াখালিতে 'আর'; 'আমাদের' উত্তরবঙ্গে 'হামার', ময়মনসিংহে 'আমরার', কুমিল্লায় 'আমাগো', বরিশালে 'মোগো', দক্ষিণবঙ্গে 'আমরা' ইত্যাদি।

২.৩. প্রচলিত বাংলা উপভাষা গবেষণার বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা

গ্রিয়ারসন ও তাঁর অনুসৃত পথ ধরে পরবর্তী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সুকুমার সেন, পরেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ যে প্রণালি ও পদ্ধতি নির্ভর করে উপরিউক্ত ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের পাশাপাশি উপভাষার শ্রেণিকরণ করেছেন তা মূলত শব্দ নির্বাচন-কেন্দ্রিক। কিন্তু শুধু শব্দই একটি ভাষার সকল প্রাণ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে না। এ ছাড়া তৎকালে শব্দ সংগ্রাহকদের ধ্বনিতাত্ত্বিক জ্ঞান পর্যাপ্ত ছিল না বলে তাদের উপাত্ত নির্ভর করে স্থিরীকৃত ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন স্বাভাবিক। এতদ্ব্যতীত ইসলাম (১৯৯৮) অবহিত করছেন যে, গ্রিয়ারসনের সমীক্ষাকৃত শব্দ-উপাদান বাংলাদেশের উপভাষাসমূহের প্রত্যেক অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করেনি; যেমন — ঢাকা জেলার জন্য কেবল মানিকগঞ্জ থেকে শব্দ সংগৃহীত হয়েছিল। ফলে এ উপাত্ত থেকে সংগৃহীত ভাষাবৈশিষ্ট্য জেলার সকল রূপের প্রতিনিধিত্ব করবে না, এটাই স্বাভাবিক। পাশাপাশি বাংলা উপভাষার শ্রেণি নির্ধারণে গ্রিয়ারসন মূলত বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানকেই প্রধান বিবেচনায় এনেছেন। এ প্রসঙ্গে গ্রিয়ারসন বলছেন :

> Our sole opportunity for discovering any sudden change of language or dialect is when population are seperated by some natural obstacle, such as great river, or a range of mountain, or when one nationality is brought face to face with another. (Grierson, 1996 : vol. I, vol. V)

কিন্তু অধিকাংশ উপভাষার নামকরণে তিনি মূলত বিভিন্ন জেলার প্রশাসনিক নামকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, যদিও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীভিত্তিক নামও দুর্লক্ষ্য নয়, যেমন হাজং, চাকমা ইত্যাদি (ইসলাম, ১৯৯৮)। ইত্যাকার অসংগতি পরবর্তীকালের উপভাষা বিশ্লেষকদের মধ্যেও লক্ষণীয়।

১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগোত্তর রাজনৈতিক সীমাভুক্ত পূর্ব বাংলা বা পূর্ব-পাকিস্তান এবং ১৯৭১ সালে সৃষ্ট বাংলাদেশ রাষ্ট্রের তিন-চতুর্থাংশ অঞ্চলের উপভাষার পরিচয় ও এদের বিশ্লেষণধর্মী বিবরণ নিয়ে প্রকাশিত গোপাল হালদারের (১৯৮৬) *A comparative grammar of East Bengali dialects* একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী, ১৯৩২-৩৭ সময়পর্বে লেখক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে গবেষণা সহকারী হিসেবে উপরিউক্ত শিরোনামে যে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেন তারই ফসল হচ্ছে এ গ্রন্থ। তবে উল্লিখিত সময়সীমায় গবেষণাকর্মটি সম্পাদিত হলেও এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে। মূলত দীর্ঘ সময় পরে প্রকাশিত হওয়ার কারণে

লেখক এতে পরবর্তী সময়ে বাংলা উপভাষা সম্পর্কে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের তথ্য, যেমন — মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত *পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* (১৯৬৫), সন্নিবেশিত করেছেন। লেখকের এই গ্রন্থ ও এ-সম্পর্কিত গবেষণাকর্মের 'East Bengal' পরিভাষাটি পূর্ব ভারতের বাংলা অঞ্চলের পূর্বভাগের রাজনৈতিক সীমা নির্দেশ করলেও, তিনি পূর্ব বাংলার উপভাষা বলতে মূলত সুনীতিকুমার (২০০২) নির্দেশিত বাংলা উপভাষা শ্রেণিবিভাগের 'বঙ্গ (Vanga)' শ্রেণিভুক্ত উপভাষাসমূহকে বুঝিয়েছেন এবং এই উপভাষাভুক্ত অঞ্চলসমূহের রাজনৈতিক সীমাকে নির্দেশ করেছেন। গ্রন্থের নামকরণ থেকেই বুঝা যায় যে, লেখক এতে বর্তমান বাংলাদেশের, বরেন্দ্র অঞ্চল ব্যতীত, উল্লিখিত উপভাষাসমূহের ধ্বনিগত, রূপগত ও শাব্দিক উপাদানের বর্ণনাধর্মী তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন যা ভবিষ্যৎ উপভাষা গবেষকদের জন্য মূলবান উপাত্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বিশেষ করে ভবিষ্যতে ইউরিয়েল ভাইনরাইখ (১৯৫৪) নির্দেশিত সাংগঠনিক পদ্ধতিতে যারা বাংলা উপভাষার বিভিন্ন রূপের সংগঠনচিত্র উপস্থাপন করতে উৎসাহী তাদের জন্য এ গ্রন্থের উপাত্তসমূহ আদর্শ বিবেচিত হতে পারে। কেননা, হালদার (১৯৮৬) উল্লিখিত উপভাষাসমূহের বিভিন্ন ধ্বনি বিশেষ করে /প/ ধ্বনির উপাভাষাভিত্তিক রূপের যে তালিকা প্রদান করেছেন (পৃ-২১) তা ঐ /প/ ধ্বনির দ্বিধ্বনিরূপের (diaphone) স্বরূপ নির্ণয়ে সহায়ক হবে। সবশেষে সুনীতি কুমার (২০০২) ও গ্রিয়ারসনের LSI-এর সঙ্গে রেখে হালদার (১৯৮৬) এই গ্রন্থে পূর্ব বাংলার উপভাষাসমূহের নতুন যে চারটি শ্রেণি নির্দেশ করেছেন তা ভবিষ্যৎ ভাষাবিজ্ঞানীদের উপভাষা গবেষণায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

গোপাল হালদারের উপরিউক্ত গ্রন্থ রচনার সমসাময়িক কালে বাংলা ভাষার একটি সুনির্দিষ্ট উপভাষা যথা চট্টগ্রামী বাংলার রূপ-রূপান্তর নিয়ে মুহম্মদ এনামুল হক *চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্যভেদ* (১৯৩৫) শিরোনামে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে এনামুল হক মূলত প্রথাগত বৈয়াকরণ হিসেবে চট্টগ্রামী বাংলার বিভিন্ন ভাষিক উপাদানের ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করেছেন। লেখক এই গ্রন্থে প্রথাবাদী, কেননা তিনি মূলত সাধু বাংলার ছাঁচে চট্টগ্রামী বাংলার বিচার বিশ্লেষণ করেছেন যা কোনো ভাষারূপের প্রথাগত ব্যাকরণ রচনার অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের বর্ণনায়, কমপক্ষে ৪ বার, লেখক চট্টগ্রামী বাংলাকে 'সাধু বাঙ্গালা'র কন্যা হিসেবে ধরে নিয়েছেন। ফলে লেখকের মনোগত উদ্দেশ্য ছিল সাধু রূপের অনুরূপ চট্টগ্রামী বাংলার বিভিন্ন উপাদানের বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা, যদিও প্রকারান্তরে তিনি এই দুই রূপের বৈপরীত্য সন্ধানের মাধ্যমে চট্টগ্রামী বুলির প্রাতিস্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ উপস্থাপন করেছেন, যেগুলো প্রকৃত অর্থেই একে আলাদা উপভাষারূপে মর্যাদা দিয়েছে। এক্ষেত্রে লেখক চট্টগ্রামী বাংলার যে চারটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রীতির কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো হলো — ১। উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য; ২। শব্দার্থ-বৈশিষ্ট্য; ৩। শব্দাবয়ব-সংক্ষেপ-পদ্ধতি; ৪। শব্দ-যোজন রীতি (পৃ. ৫২০-২১)। লেখকের বর্ণনায় চট্টগ্রামী রূপ হচ্ছে বাংলা ভাষার 'সর্ট-মাউথ্', কেননা 'চট্টলাবাসীদের উচ্চারণ ত্রস্ততার জন্যই এ ভাষারূপের শব্দাবয়ব আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য হয়' — যা চট্টগ্রামী রূপকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এই গ্রন্থের

প্রথম পরিচ্ছেদে অর্থাৎ উপক্রমণিকায় লেখক চট্টগ্রামি বাংলার সঙ্গে 'সাধু বাঙ্গালা'র সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সরস বর্ণনায় সাধু রূপ তথা বাংলার কেন্দ্রীয় রূপের পরিচয়ের পাশাপাশি কেন্দ্রের সঙ্গে চট্টগ্রামি বাংলার পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থাৎ চট্টগ্রামী বুলির ওপর কেন্দ্রের শব্দগত নিয়ন্ত্রণের স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন। পাশাপাশি এই বর্ণনায় তিনি চট্টগ্রামি উপভাষার মূল কেন্দ্র বা চট্টগ্রামের সাধু বুলির কেন্দ্রভূমি যা একদিনে সীতাকুণ্ডু পর্বতের পূর্ব থেকে মাতামুহুরী নদীর তীর ও অন্যদিকে সীতাকুণ্ডু পর্বতের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। তারই ধারাবাহিকতায় তিনি চট্টগ্রামি বুলির একদিকে প্রান্তবর্তী অবস্থান হিসেবে কক্সবাজারের টেকনাফ অঞ্চলকে নির্দেশ করেছেন। আধুনিক উপভাষাতত্ত্বের কেন্দ্রের সঙ্গে উপভাষার সম্পর্ক, উপভাষার কেন্দ্র-ধারণা ইত্যাদি অন্যতম তাত্ত্বিক আলোচনা হিসেবে বিবেচিত যা তাঁর গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। তবে এই গ্রন্থের কিছু সীমাবদ্ধতাও দুর্লক্ষ্য নয়। ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো বর্ণনা এখানে নেই। এক্ষেত্রে উপাত্ত বর্ণনার প্রকৃতি থেকে বুঝা যায় যে, এগুলো মূলত লিখিত রূপ থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। ফলে চতুর্থ অধ্যায়ে স্বর ও ব্যঞ্জনতত্ত্বের বর্ণনায় 'ধ্বনির' পরিবর্তে 'বর্ণ' অভিধাটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই বর্ণনায় অক্ষর বলতে মূলত বর্ণকে নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন — 'ত্র্যক্ষরা' শব্দের উদাহরণ হিসেবে 'লম্বা' 'চম্পা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে স্বর বা ব্যঞ্জনের অনেক ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত নয়। উদাহরণস্বরূপ — 'চারি', 'সারি' ইত্যাদি শব্দের ধ্বনি পরিবর্তনের মাধ্যমে যথাক্রমে 'চাইর' ও 'সাইর'-এ পরিবর্তিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি সুস্পষ্টভাবে 'অপিনিহিতি' হলেও তিনি এই পরিবর্তনকে 'অপিনিহিতি' নামে অভিহিত করেননি।

মুহম্মদ এনামুল হকের উপরিউক্ত গ্রন্থের বর্ণনাসমৃদ্ধ ধারারই আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর *সিলেটি ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা* (১৩৬৮)। লেখক এই গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশে উল্লেখ করেছেন যে, মুহম্মদ এনামুল হকের *চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্যভেদ* তাঁর এই গ্রন্থ রচনার পেছনে ছায়াপাত তৈরি করেছে, যার প্রভাব তাঁর বর্ণনা অংশে — অর্থাৎ সিলেটি ভাষারূপের বিভিন্ন ভাষিক রূপ যথা — ধ্বনি-পরিবর্তন, বর্ণোচ্চারণ, পদ বর্ণনা, ধাতু ও বিভক্তি বিশ্লেষণে — ফুটে উঠেছে। এই গ্রন্থের 'সিলেটে প্রচলিত ভাষা ও লিপিগুলির বিবরণ' একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত, যেখানে তিনি সিলেটি নাগরী লিপির বিবর্তনকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

বাংলা উপভাষা চর্চার ইতিহাসে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত *পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* (১৯৬৫) (যা স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে *বাংলাদেশের আঞ্চলিক অভিধান* নাম ধারণ করে) বিশেষ গুরুত্ববাহী। যদিও বাংলা ভাষী অঞ্চলে ১৯২৩ সালে 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' কর্তৃক প্রকাশিত মি. এফ. ই. পার্জিটার রচিত *Vocabulary of Peculiar Vernacular Bengali Word* প্রথম উপভাষার অভিধান হিসেবে স্বীকৃত (শহীদুল্লাহ ১৯৬৫, বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯১), তবু শহীদুল্লাহর অভিধানটি বৃহৎ বাঙালি জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দসম্ভারকে নথিবদ্ধ করার প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টা হিসেবে কৃতিত্বের দাবিদার। ১৯৫৮ সালে ঢাকার বাংলা একাডেমী কর্তৃক চালু হওয়া এ

অভিধানের শব্দ-সংগ্রহের প্রকল্পে জার্মান উপভাষাতাত্ত্বিক ভেনকার অনুসৃত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে লিখিত চিঠির মাধ্যমে স্থানীয় শিক্ষকদের অনুরোধ করে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন উপভাষার মোট ১,৬৬,২৪৬টি শব্দ সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু এই সংগ্রহ কার্যক্রমে বেশ কিছু পদ্ধতিগত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, এতে দেখা যায় যে, বেশ কিছু শহুরে সংগ্রাহক শহরে অবস্থান করে লোক মারফত শব্দ সংগ্রহ করেছেন। ফলে শব্দের অর্থ ও বানানে অসংগতি লক্ষ করা গেছে। আবার অনেক সংগ্রাহক অভিধানতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না বলে একদিকে শব্দের যথাযথ উচ্চারণ যেমন লিখতে পারেননি, অন্যদিকে তেমনি IPA সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিল না। তাই এসব অনিবার্য অসংগতি দূর করার জন্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহ উপভাষা-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জেলার অধিবাসীর সঙ্গে মিলিত হয়ে দীর্ঘ ১৭টি আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন শব্দের উচ্চারণ পদ্ধতি ঠিক করার পাশাপাশি অনেক অবাঞ্ছিত শব্দ বর্জন করে শেষ পর্যন্ত ৭৫,০০০ ভুক্তি অভিধানে প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করেন। উপরিউক্ত পদ্ধতিগত ত্রুটি সত্ত্বেও এই অভিধান প্রকাশের পরপরই উভয় বাংলায় ব্যাপক সমাদর ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। সেই সঙ্গে দুই বাংলারই প্রসিদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানীরা এই অভিধান প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এদের মধ্যে গোপাল হালদার (১৯৮৬) একে 'অত্যন্ত সন্তোষজনক প্রকাশনা' (splendid publication) হিসেবে আখ্যায়িত করেন। অন্যদিকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ অভিধানের যে ভূয়সী প্রশংসা করেন, তা যৌক্তিক কারণেই এখানে তুলে ধরা যেতে পারে (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯১, পৃ. পনেরো থেকে উদ্ধৃত)।

> I can say that it is a great work the Bangla Academy has undertaken, and generations of Bengali speakers whether in India or in East Bengal will be grateful to Bangla Academy for having taken in hand what promises to be a monumental work.

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত *পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* (১৯৬৫) পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বিদ্বৎ সমাজকে আলোড়িত করে। ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৭ সালে সুকুমার সেনকে উপদেষ্টা করে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পশ্চিম বাংলার বাংলা উপভাষাসমূহের শব্দভিত্তিক 'আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান' প্রকল্প গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের বিশেষজ্ঞবৃন্দ ঢাকার শহীদুল্লাহ (১৯৬৫) সম্পাদিত আঞ্চলিক অভিধান প্রকল্পের পদ্ধতিগত ত্রুটি সম্পর্কে আগেই অবহিত ছিলেন বলে তা কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে ১৫ জন গবেষক নিয়োগ করেন, যারা ক্ষেত্র সমীক্ষা পদ্ধতি (field method) অবলম্বনে সরজমিনে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পরিদর্শনপূর্বক শব্দ সংগ্রহ করেন। তারা ক্যামেরাসহ অডিও রেকর্ডারের সাহায্যে উপভাষীদের কাছ থেকে শব্দ রেকর্ড করেন। পরবর্তীকালে রেকর্ডকৃত শব্দ শ্রবণপূর্বক তার ধ্বনিবৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি প্রতিটি শব্দের IPA নির্ধারণ করেন। এভাবে তারা আধুনিক ভাষাবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রায় তিন লক্ষ শব্দ সংগ্রহ করেন, যার প্রথম খণ্ড ১৯৯১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯১)।

আধুনিক ক্ষেত্র-সমীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলা ভাষার উপভাষাসমূহের অভিধান প্রণয়নের পাশাপাশি আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ *A study of standard Bengali*

and the Noakhali dialect (১৯৮৫) গ্রন্থে চমস্কি ও হালে (১৯৬৮) প্রবর্তিত সৃষ্টিশীল পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রমিত চলিত বাংলা ও নোয়াখালী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যতাত্ত্বিক রূপের বর্ণনা প্রদান করেন। এই গ্রন্থে জনাব মোরশেদ এই দুই-ভাষারীতির বৈপরীত্য বিশ্লেষণ (contrastive analysis) পদ্ধতির আলোকে উপরিউক্ত তিনটি রূপের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা ও সূত্রাদি নির্মাণ করেছেন। এদিক থেকে বাংলা উপভাষার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে সৃষ্টিশীল ব্যাকরণনির্ভর রীতি পদ্ধতি প্রয়োগের প্রথম প্রয়াস এটি। গ্রন্থের শেষে লেখক অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বাংলা ভাষার বিভিন্ন ভাষিক উপাদান বিশেষ করে রূপ সংগঠনের অন্তর্নিহিত জটিলতার কারণে তার যথাযথ ব্যাখ্যার স্বার্থে চমস্কির সৃষ্টিশীল ব্যাকরণতত্ত্বের তাৎপর্যপূর্ণ সংশোধন ও পরিবর্তন প্রয়োজন (মোরশেদ, ১৯৮৫)।

বাংলাদেশে উপভাষা চর্চার সাম্প্রতিক ইতিহাসে মনিরুজ্জামানের *উপভাষা চর্চার ভূমিকা* (১৯৯৪) নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এ অঞ্চলে উপভাষা চর্চার ইতিহাসে এটি একটি আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। এটিই বাংলা ভাষার প্রথম গ্রন্থ যেখানে বাংলা উপভাষা চর্চার ইতিহাসের বিস্তারিত ফিরিস্তি প্রদান করা হয়েছে। লেখক গ্রন্থের 'প্রাক কথন' অংশে নিজেই উল্লেখ করেছেন, 'বাংলা উপভাষা নিয়ে এটাই সম্ভবত প্রথম একক ও বিস্তারিত প্রচেষ্টা' (পৃ-৪)। এটি মূলত লেখকের পিএইচ.ডি. গবেষণাকালীন সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলা উপভাষাগুলির যে সমকালীন বিবরণ প্রস্তুত করা হয়েছিল তারই একটি উপজাত গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। এটিই বাংলাভাষার প্রথম গ্রন্থ যেখানে লেখক আধুনিক উপভাষাতত্ত্বের কিছু তাত্ত্বিক ধারণা, যেমন — ভাষা অনবচ্ছেদ, দুটি ভাষার প্রান্তিক পরিস্থিতি, ইত্যাদির সরল বর্ণনা প্রদান করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে বাংলা উপভাষা পরিস্থিতি থেকে উদাহরণ প্রদান করেছেন। এতদ্ব্যতীত এ গ্রন্থে তিনি পূর্ববঙ্গীয় উপভাষাসমূহের প্রধান ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য 'অপনিহিতির' বিস্তৃত বর্ণনা যথা — অপিনিহিতি চর্চার ইতিহাস, অপিনিহিতি সম্পর্কে বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিকদের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, বাংলার সমগোত্রীয় অন্যান্য ভাষা যথা ওড়িয়া, অসমিয়ার অপিনিহিতি বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এটি শুধু এ গ্রন্থের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অধ্যায়ই নয়, বরং সমগ্র বাংলা ভাষার ইতিহাসে অপিনিহিতি সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণও বটে।

মনিরুজ্জামান (১৯৯৪) তাঁর *উপভাষা চর্চার ভূমিকা* গ্রন্থে বাংলাদেশের জেলাসমূহের পরিচয়ভিত্তিক উপভাষাসমূহের যে বর্ণনা প্রদান করেছেন তার অধিকাংশেরই উৎস হচ্ছে দ্বৈতীয়িক (secondary)। অর্থাৎ অন্য গবেষকদের সংগৃহীত বর্ণনাই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। ফলে এসব ক্ষেত্রে উপাত্ত বর্ণনার মূল পদ্ধতিটি হচ্ছে মিশ্র অর্থাৎ কখনো তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক, আবার কখনো বর্ণনামূলক। আবার অনেক উপভাষার বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখক নিজস্ব তথ্যের ওপরও নির্ভর করেছেন। এক্ষেত্রে তা হয়ে উঠেছে বর্ণনামূলক অর্থাৎ সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানভিত্তিক। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ গ্রন্থটি লেখকের পি.এইচ.ডি. গবেষণাকর্মের উপজাত গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু তিনি কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করে তাঁর উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন এ সংক্রান্ত কোনো উল্লেখ বা বর্ণনা এ গ্রন্থে নেই। লেখক অবশ্য 'প্রাক কথন' অংশে উল্লেখ করেছেন যে, ইচ্ছা করেই তিনি উপাত্ত

সংগ্রহের মেথডলজি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। কিন্তু তাঁর এ ধরনের ইচ্ছার যৌক্তিক কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেননি। অন্যদিকে আমরা যদি উপভাষাতত্ত্বের মতো মাঠভিত্তিক গবেষণা শাস্ত্রের বিশ্বখ্যাত গবেষণাকর্মগুলি পর্যবেক্ষণ করি তা হলে দেখব যে, গবেষকরা তাঁদের প্রতিটি গবেষণাকর্মেই অপরিহার্যভাবে উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতির বর্ণনা করেছেন। আমরা মনে করি, লেখক যদি উপভাষার উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতির বর্ণনা করতেন তাহলে ভবিষ্যৎ বাংলা উপভাষা-গবেষকেরা তা থেকে উপকৃত হতেন। লেখক তাঁর নিজস্ব উপাত্ত সংগ্রহের সাংগঠনিক বা বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করলেও আধুনিক সাংগঠনিক উপভাষাতত্ত্বের অনেক অপরিহার্য তাত্ত্বিক বর্ণনাই এখানে উপেক্ষিত থেকেছে। বিশেষ করে তাঁর বাংলা উপভাষা বিশ্লেষণে সাংগঠনিক উপভাষাতত্ত্বের অতি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব-অভিধা দ্বিরীতিসংশ্রয়ের কোনো বর্ণনাই নেই। অর্থাৎ দুটি বাংলা উপভাষার আপাত সাদৃশ্যযুক্ত দুটি ধ্বনি পরিবর্তনের পার্থক্যসমূহকে এই দ্বিরীতিসংশ্রয় তত্ত্বের আলোকে তিনি ব্যাখ্যা করেননি। তাঁর বর্ণনায় বাংলা মূলধ্বনিসমূহ কীভাবে রূপান্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন উপভাষাগত রূপ ধারণ করেছে তার তাত্ত্বিক ভাবনা প্রসূত দ্বিধ্বনিমূলের (diaphoneme) কোনো বর্ণনা নেই। লেখক এ গ্রন্থে উপভাষা-ভূগোল তথা ফিলোলজিক্যাল বা প্রথাগত উপভাষাতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করলেও এ উপভাষাতত্ত্বের যাত্রা কীভাবে শুরু হয়েছে তার কোনো বিবরণ প্রদান করেননি। এতদ্ব্যতীত জার্মান উপভাষাতাত্ত্বিক গিয়র্স ভেনকার যাঁর হাত দিয়ে উপভাষা-ভূগোলের যাত্রা শুরু হয়েছে, তাঁর সম্পর্কে কোনো তথ্য উল্লেখ করেননি। ঢাকাই উপভাষার বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক শুধু ঢাকার একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল আদিয়াবাদের (লেখকের জন্মস্থান) ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণেই সচেষ্ট থেকেছেন। এতে বৃহত্তর ঢাকা জেলার ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্বকারী বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেনি। গ্রন্থের শেষে সংযুক্ত গ্রন্থ তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় যে, তিনি তাঁর গবেষণাকর্ম সম্পাদনকালে প্রায় সব বাংলা বই ও গবেষণাপত্রসহ ইংরেজি ভাষার উপভাষাতত্ত্ব-সম্পর্কিত সে-সময়ে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য অধিকাংশ বই সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, তাঁর এ গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় ১৪ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৮০ সালে প্রকাশিত বিশ্ব উপভাষাতত্ত্বের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বই চেম্বার্স ও ট্রাডগিলের *Dialectology*-র কোনো উল্লেখ এতে নেই। ফলে ধারণা করা যায় যে, *Dialectology* গ্রন্থে উল্লেখিত আধুনিক উপভাষাতত্ত্বের অনেক মৌলিক ও তাত্ত্বিক বিষয় সম্পর্কে এই লেখকের বর্ণনা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

বাংলাভাষী অঞ্চল তথা বাংলাদেশের বিভিন্ন উপভাষা বিশ্লেষণের সর্বশেষ বড়ো উদ্যোগটি গ্রহণ করে ঢাকাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ। 'বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা' নামে ২০০৪ সালে তাদের গৃহীত একটি প্রকল্পে স্বাধীন বাংলাদেশের ১৬টি প্রাক্তন জেলার বিভিন্ন উপভাষার ক্ষেত্র-সমীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্তের বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়। তাদের এই ফলাফল পরে *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা*-৬ 'ভাষা ও সাহিত্য' খণ্ডে (২০০৭) প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, এই খণ্ডের সম্পাদক হচ্ছেন আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, যিনি উপভাষা সমীক্ষায় নিযুক্ত ১৭ জন গবেষক, যারা

মূলত বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও ভাষাবিজ্ঞানের শিক্ষক, তাঁদের দলনেতা হিসেবে গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধান করেছেন। এই গবেষকদের বিশ্লেষণে বিভিন্ন উপভাষার বিভিন্ন রূপের কাঠামো ব্যাখ্যায় বর্ণনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। কারণ, তাঁরা ধ্বনিমূল, রূপমূল, বাক্য সংগঠন ইত্যাদি উপাদানগত একক ধরে উপভাষার বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু তাদের বর্ণনার ধরন খুবই প্রথাগত ও সরল, কেননা তাঁরা মূলত প্রতিটি অঞ্চলিক রূপের প্রাতিস্বিক বা স্বতন্ত্র ধ্বনিমূল বা রূপমূল শনাক্তকরণেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। এ ধরনের বিশ্লেষণ থেকে মনে হয়, বাংলা ভাষার প্রতিটি আঞ্চলিক রূপের বিভিন্ন স্বতন্ত্র ধ্বনিমূল ও রূপমূল একক রয়েছে যেগুলো স্থানগত বা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কারণে প্রমিত বাংলার ধ্বনিরূপ ও রূপমূল থেকে জন্মলাভ করেছে। কিন্তু উপভাষা বিশ্লেণের ক্ষেত্রে বিষয়টি এত সরল নয়। দুটি উপভাষার প্রান্তবর্তী অঞ্চলে পরস্পরের প্রভাবে যে জটিল ধ্বনিগত ও রূপগত পরিবর্তনের দ্বারা বিভিন্ন সমধ্বনিরেখা, সমরূপরেখা বা সমশব্দরেখা গড়ে উঠেছে তার কোন্ ঔপভাষিক রূপ যথা — মিশ্র বা প্রাতিস্বিক রূপ প্রান্তবর্তী মানুষেরা করে সে ধরনের আলোচনাও নেই। মাঝে মাঝে গবেষকরা সুনীতিকুমারকে (২০০২) অনুসরণ করে নির্দিষ্ট উপভাষার ধ্বনির পরিবর্তনের বর্ণনা প্রদান করেছেন। কিন্তু কোন্ প্রতিবেশগত শর্তের কারণে ঐ নির্দিষ্ট ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন ঘটেছে, তা শনাক্ত করতে সমর্থ হননি এবং ঐ পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য নির্দেশপূর্বক কোনো ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রদানের সক্ষমতা দেখাতে পারেননি, যেটি তাদের সমীক্ষা-দলনেতা মোরশেদ (১৯৮৫) নোয়াখালীর উপভাষা ও বাংলার চলিত রূপ বিশ্লেষণে অবলীলায় উপস্থাপক করেছেন। আসলে, উপভাষা বিশ্লেষণে বিশেষভাবে প্রয়োজন সাংগঠনিক ও রূপান্তরমূলক ভাষাবিজ্ঞানে অ্যাকাডেমিকভাবে প্রশিক্ষিত ভাষাবিজ্ঞানী। জনাব মোরশেদ বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের মাধ্যমে ওই বিশ্লেষণ ক্ষমতা ভালোভাবেই রপ্ত করেছিলেন। কিন্তু উক্ত প্রকল্পের উপভাষা-সংগ্রাহকরা বিভিন্ন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হলেও এ ধরনের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁদের ছিল না। ফলে তাঁরা উপভাষার ধ্বনি বা রূপ বিশ্লেষণে আধুনিক সাংগঠনিক বা রূপান্তরমূলক গভীর ব্যাখ্যা প্রদানের সমর্থ হননি। আবার কোনো কোনো গবেষকের বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ অনেক সময় বর্ণনামূলক বা সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের রীতি পদ্ধতি দ্বারা সমর্থিত হয়নি। যেমন, রংপুরের উপভাষা বিশ্লেষণে গবেষক মুহঃ হামিদুর রহমান ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যের পৃথক প্রথাগত বিশ্লেষণের পাশাপাশি আলাদা করে আবার এ ভাষার কিছু ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন যাতে পূববর্তী আলোচনার ছায়াপাত ঘটেছে। এছাড়া তাঁর এই 'ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য' বর্ণনা ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যতাত্ত্বিকভাবে পৃথক হলে আরও বেশি সাংগঠনিক তত্ত্ব-পদ্ধতি দ্বারা সমর্থিত হতো। জনাব হামিদুর tone-এর বাংলা করেছেন 'স্বর', যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এরকম আরও অনেক সীমাবদ্ধতা বিভিন্ন গবেষকের আলোচনায় দেখা গেছে। যেহেতু এটি একটি প্রকল্পভিত্তিক উপভাষা গবেষণা চর্চা, সেহেতু বিভিন্ন গবেষকের মধ্যে উপভাষার রূপ বর্ণনায় এক ধরনের কাঠামোগত সমন্বয় থাকা জরুরি ছিল। কিন্তু এ কাঠামোগত সমন্বয়হীনতা সর্বত্র লক্ষণীয়। তবে এই প্রকল্পের উপভাষা চর্চার গুরুত্ব হলো ভবিষ্যতে প্রশিক্ষিত ভাষাবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন উপভাষার

এ ধরনের সরল বিশ্লেষণকে প্রাথমিক উপাত্ত হিসেবে বিবেচনা করে, যে উপাত্তগুলো এ গ্রন্থের গবেষকরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেছেন, তার ধ্বনি, রূপ ও বাক্যের সাংগঠনিক ও রূপান্তরমূলক সূত্রাদি নির্মাণ করবেন যেগুলো সংশ্লিষ্ট উপভাষার অন্তর্নিহিত স্বরূপ উন্মোচনে সহায়তা করবে।

বাংলা উপভাষা চর্চার উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, এ ভাষার বিভিন্ন উপভাষা গবেষণার সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে ঐতিহাসিক, তুলনামূলক ('তৌলন', মনিরুজ্জামানের পরিভাষায় [১৯৯৪]) ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে এদের বিভিন্ন রূপের বিশ্লেষণ। কিন্তু যেহেতু এখন পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে শুধু উপরিউক্ত পদ্ধতির প্রয়োগজনিত সীমাবদ্ধতার কারণে (দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, উদাহরণস্বরূপ — মোরশেদ, ১৯৮৫) সাংগঠনিক ও সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পদ্ধতির ব্যবহারই শুরু হয়নি, সেহেতু বাংলা উপভাষাতত্ত্বে এই তিন ধারার ক্রমরূপান্তরের স্বরূপ এখনও উন্মোচন করা সম্ভব হয়নি।

৩. বাংলা উপভাষা চর্চার নতুন সম্ভাবনা : সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনাসমূহ

গ্রিয়ারসন থেকে শুরু করে তৎপরবর্তী সময়ের সকল ভাষাবিজ্ঞানীই বাংলা উপভাষা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মূলত ঐতিহাসিক, তুলনামূলক বর্ণনামূলক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন এবং এসব উপভাষার ধ্বনি ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে সচেষ্ট থেকেছেন, যদিও এদের বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ এক্ষেত্রে অনুদ্ঘাটিতই থেকে গিয়েছে। এ ধরনের সরল বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ, যদিও তা সাংগঠনিক উপভাষাতত্ত্বের তত্ত্ব ও পদ্ধতি দ্বারা সমর্থিত নয়, তবু আমাদের এ প্রতীতি জন্মাতে সাহায্য করে যে, বাংলা উপভাষাগুলি যেন ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে স্বয়ংসিদ্ধ এবং দুটি নিকটবর্তী উপভাষার প্রান্তসীমায় এদের মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদরেখা বিদ্যমান। ফলে এক একটি উপভাষার পৃথক পৃথক ধ্বনি ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বিষয়টি এত সরল নয় এবং বাস্তবে দুটি উপভাষার প্রান্তসীমায় সুস্পষ্ট ভেদরেখার পরিবর্তে এক ধরনের উপভাষা-অনবচ্ছেদ (language continuam) অবস্থা বিরাজমান। এই 'উপভাষা-অনবচ্ছেদে' সংশ্লিষ্ট দুটি উপভাষার বিভিন্ন ভাষিক উপাদান সংমিশ্রিত হয়ে এক নতুন স্তর তৈরি করে যার স্বরূপ উন্মোচন অতি জরুরি। আর তা নিরূপণে আধুনিক উপভাষাতত্ত্বে গড়ে উঠেছে 'সমশব্দ গণ্ডিরেখা' (isogloss), 'সমরূপ গণ্ডিরেখা' (isomorph), 'সমধ্বনি রেখা' (isophone) ইত্যাদি অভিধা। দুটি উপভাষার প্রান্তবর্তী অঞ্চলে সাধারণত সমশব্দ, সমরূপ বা সমধ্বনি গণ্ডিরেখা অধিক, যেখানে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে (focal area) এ অবস্থা ন্যূনতম। ফলে কেন্দ্রীয় অঞ্চল অপেক্ষা দুটি উপভাষার প্রান্তবর্তী অঞ্চল ও এর অভ্যন্তরীণ প্রবহমান ভাঙচুর-সংক্রান্ত ক্রিয়াশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাংলা উপভাষা বিশ্লেষণতত্ত্বে এখনও সংশ্লিষ্ট দুটি উপভাষার 'সমশব্দ গণ্ডিরেখা' বা 'সমরূপ গণ্ডিরেখা' অথবা 'সমধ্বনি গণ্ডিরেখা' শনাক্তকরণ বা এদের স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়নি। এ বিষয়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উপভাষা-গবেষকগণ দৃষ্টি নিবিষ্ট করতে পারেন।

রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে কোনো অঞ্চল একটি দেশের নতুন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বলে বিবেচিত হলে সে অঞ্চলের উপভাষা শিষ্ট বা প্রমিত ভাষারূপে মর্যাদাপ্রাপ্ত হতে পারে, অথবা অন্য প্রভাবশালী কেন্দ্রের শিষ্ট ভাষা রূপটি নতুন কেন্দ্রের এ স্থান দখল করতে পারে। পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হিসেবে ঢাকার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে। অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে ঢাকা এ অঞ্চলের রাজধানী হিসেবে মর্যাদা লাভের পর ঢাকার স্থানীয় ভাষারূপটি এর প্রমিত ভাষা না হয়ে বরং কোলকাতা ও এর পার্শ্ববর্তী প্রাধান্যবিস্তারী শিষ্ট ভাষাটি এ স্থান দখল করেছে। ফলে এখানে দুটি ভাষা পরিস্থিতি বিরাজমান থাকার কারণে এক ধরনের সাংঘর্ষিক অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় এ দুটির আন্তর কাঠামো পরিবর্তনের মাধ্যমে এক ধরনের স্থিতাবস্থা লাভ করেছে এবং নতুন ভাষা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যেখানে স্থানীয় রূপটি 'অধঃস্তর' (substratum) এবং শিষ্ট রূপটি উপরিস্তর (superstratum) রূপে বিরাজ করছে। বাংলাদেশের উপভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণে ঢাকা নগরীর ভাষা-কাঠামোর 'অধঃস্তর' ও 'উপরিস্তরের' অন্তঃকাঠামো ও এর পরিবর্তন প্রক্রিয়ার আন্তর সূত্রটি বিনির্মাণ অত্যন্ত জরুরি।

উপভাষার কাঠামো নির্মাণে 'গ্রাম্যভাষা'র স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। গ্রাম্যভাষা অভিধাটি জার্মান volk-sprache-র পবিত্র সরকারকৃত বাংলা রূপান্তর (সরকার, ১৩৯৮)। এখানে 'গ্রাম্যভাষা' বলে গ্রামে বসবাসরত জনসাধারণের ভাষাকে বুঝানো হচ্ছে না; 'গ্রাম্যভাষা' শহরেরও হতে পারে বা গ্রামেও প্রচলিত থাকতে পারে। পবিত্র সরকারের মতে, ভাষার গ্রামীণতার যে লক্ষণগুলিকে শহরের লোক আলাদা বলে চিহ্নিত করে সেগুলোই গ্রাম্যভাষার নির্ধারক। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রতিদিনই প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জনস্রোত ঢাকায় ছুটে আসছে। এই জটিল ও বিভিন্ন স্তরভিত্তিক ঢাকার নাগরিক জীবনে তারা আবাস গড়লেও তাদের ভাষা প্রকাশটি কিন্তু গ্রামীণই থেকে যাচ্ছে, যদিও এর আন্তঃকাঠামোর নিত্য কিছু পরিবর্তন ঘটছে। পবিত্র সরকার আমাদের জানাচ্ছেন যে, কোলকাতায় যে গ্রাম্যভাষাটি প্রাধান্য বিস্তার করেছে, তা মূলত চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের উপভাষাভিত্তিক একটি আদর্শায়িত রূপ। তাঁর বিবেচনায়, ঢাকায়ও একটি প্রাধান্যবিস্তারী গ্রাম্যভাষা গড়ে উঠেছে, যদিও তা কোন্ উপভাষাভিত্তিক তিনি তার কোনো তথ্য আমাদের প্রদান করেননি। আধুনিক বাংলা উপভাষাতত্ত্বে ঢাকার গ্রাম্যভাষার আন্তরসূত্র নির্মাণের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রপঞ্চরূপে পরিগণিত হতে পারে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে পার্শ্ববর্তী বাঙালি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দৈনন্দিন জীবন-যাপনের জন্য এক ধরনের নিরবচ্ছিন্ন মিথস্ক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে ঐ আদিবাসীরা স্থানীয় বাঙালি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য যে ভাষারূপটির আশ্রয় নিচ্ছে তার অন্তর্নিহিত স্বরূপটি কী তা এখনও বিশ্লেষিত হয়নি। ধারণা করা যায়, বাঙালি জনগোষ্ঠী যেহেতু এ ভূখণ্ডে জনবিন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি (main stream) হিসেবে সুবিধাপ্রাপ্ত, তাই এ ক্ষেত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট বাংলা উপভাষাটি আয়ত্ত করে নিচ্ছে। কিন্তু এই আয়ত্তকরণের

ক্ষেত্রে কোনো নতুন ভাষা সৃজন প্রক্রিয়া বা পিজিনিকরণ ও ক্রেয়লীকরণ ঘটছে কিনা তা বাংলা উপভাষাতত্ত্বে গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপভাষা গবেষণার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজন একদল গবেষকের যারা আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। বিশেষ করে, সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের গবেষণার ধরন ও রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে যে সমস্ত গবেষক শুধু অবহিতই নন, বরং মাঠ পর্যায়ে গবেষণা অর্থাৎ উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে এসব উপাত্ত ও তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক ফলাফল প্রাপ্তি ও অর্জিত ফলাফল থেকে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যাঁদের দক্ষতা রয়েছে সে সমস্ত সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানী এ ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারেন। আরেকটি বিশেষ কারণে বাংলাভাষী অঞ্চলে সাংগঠনিক উপভাষাতত্ত্ব চর্চার অবকাশ রয়েছে। ১৯৫৪ সালে উরিয়েল ভাইনরাইখ কর্তৃক সাংগঠনিক উপভাষাতত্ত্বের প্রস্তাবনার পর প্রায় অর্ধ-শতক পেরোলেও আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি গবেষক এ ধারা অবলম্বন করে উপভাষা চর্চায় এগিয়ে আসেননি। ফলে বাংলা উপভাষা চর্চায় এ ক্ষেত্রে এক ধরনের শূন্যতা বিরাজ করছে। তাই যৌক্তিক কারণেই বাংলা ভাষী অঞ্চলে সাংগঠনিক উপভাষাতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এর মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক উপভাষাতাত্ত্বিকরা বাংলার বিভিন্ন উপভাষার বিভিন্ন রূপের নতুন অন্তঃসূত্র উন্মোচন করতে পারেন। এ ধারার উপভাষা-তাত্ত্বিকদের প্রাথমিক করণীয় হচ্ছে, বাংলা ভাষার একাধিক উপভাষা ভ্যারাইটির যে কোনো উপাদানের দ্বিরীতিসংশ্রয় (diasystem) তৈরি করা। এ ক্ষেত্রে প্রথমে যৌক্তিকভাবেই এ ভাষার বিভিন্ন উপভাষার ধ্বনি উপাদানগুলো ব্যবহৃত হতে পারে। কেননা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার উপভাষাগুলোর সাংগঠনিক আলোচনায় ধ্বনি পরিবর্তন-সংক্রান্ত দ্বিরীতিসংশ্রয়ই সবচেয়ে বেশি তৈরি হয়েছে।

বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপভাষাসমূহের ধ্বনি পরিবর্তন সংক্রান্ত দ্বিরীতিসংশ্রয় কীভাবে তৈরি করা যায় তার দু-একটি নমুনা এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে। ভাইনরাইখকে (১৯৫৪) অনুসরণ করে ট্রাস্ক (১৯৯৬) বলেন যে, দ্বিরীতিসংশ্রয় হচ্ছে একটি ধ্বনি সংশ্রয় যা অনেকটা উচ্চস্তরীয় বিমূর্ত সংগঠন বা ছক যেটি সহসম্পর্ক যুক্ত একাধিক রূপের আপাত পার্থক্যের সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়। বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা বাংলাদেশের দুটি উপভাষারূপের উদাহরণ গ্রহণ করতে পারি। যেমন, ঢাকার প্রমিত রূপের (ক অঞ্চল) নিম্নোক্ত স্বর সংশ্রয় (আংশিক) আছে।

অঞ্চল ক : ঢাকা (প্রমিত রূপ)

/ আ /	(আম)
/ ও /	(চোর, বোবা)
/ আও /	(খাওয়া, দাওয়া)

অন্যদিকে, ঢাকার প্রমিত রূপের এই স্বর সংশ্রয়টি কিশোরগঞ্জের (খ অঞ্চল) উপভাষায় নিম্নোক্ত পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে।

অঞ্চল খ : কিশোরগঞ্জ

/ আঃ /	(আম)
/ ও /	(বোবা)
/ উ /	(চুর)
/ আও /	(খাওয়া, দাওয়া)

উপরিউক্ত দুটি রূপের ধ্বনির পরিবর্তন ও বৈচিত্র্যকে নিম্নোক্ত দ্বিরীতিসংশ্রয় ছকে বিন্যস্ত করা যায়।

$$\text{ক, খ} \; // \; \text{আঃ} \approx \begin{array}{c}\text{ক}\\ \text{খ}\end{array} \frac{\text{ও}}{\text{ও} \sim \text{উ}} \approx \text{আউ} \; //$$

চিত্র ৪ : বাংলা ভাষার দুটি ভাষারূপের ধ্বনি পরিবর্তনের সরল দ্বিরীতিসংশ্রয়

এই দ্বিরীতিসংশ্রয় ছক বা সূত্রটি ঢাকার প্রমিতরূপ ও কিশোরগঞ্জের উপভাষার[৩] আংশিক স্বর সংশ্রয়ের আপাত সাদৃশ্য ও আপাত বৈপরীত্যের সাংগঠনিক বর্ণনা দেয় এবং এ দুটি ভাষারূপের ধ্বনি পরিবর্তনের মধ্যে যে এক ধরনের প্রণালিবদ্ধতা কাজ করছে তাও নির্দেশ করে। উপরের সূত্রের ক অঞ্চলের /ও/ ধ্বনির সঙ্গে খ অঞ্চলের /ও/ ~ /উ/ ধ্বনিগত রূপায়ণের এক ধরনের পরিবর্তনজনিত যোগসূত্র লক্ষণীয় যেখানে এটা ব্যক্ত হচ্ছে যে, ক অঞ্চলের /ও/ ধ্বনিযুক্ত শব্দসমূহের মধ্যে বিশেষ প্রতিবেশসমৃদ্ধ কিছু শব্দের /ও/ ধ্বনি খ অঞ্চলে /উ/ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। /ও/ ধ্বনিযুক্ত ঐসব শব্দের প্রতিবেশযুক্ত শর্ত এ সূত্রে রূপায়িত না হলেও সূত্রের ব্যাখ্যা অংশে সহজেই বর্ণিত হতে পারে। সূত্রে ব্যবহৃত বিশেষ চিহ্নগুলি সম্পর্কে বলা যায় যে, '//' (যুক্ত শ্লেস) চিহ্নটি সূত্রের সীমা নির্দেশ করে, '≈' (যুক্ত ঢেউ) চিহ্ন সূত্রের মধ্যে উভয় উপভাষা ভ্যারাইটিতে কোনো ধ্বনির সাধারণ (common) বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়। সবশেষে, (একক ঢেউ) চিহ্নটি সংশ্লিষ্ট ধ্বনির পরিবর্তনকে সূচিত করে। উপরিউক্ত সূত্রটি দুটি ভাষারূপের ধ্বনি পরিবর্তন ও ধ্বনির সাদৃশ্যের ব্যাখ্যাসম্পৃক্ত দ্বিরীতিসংশ্রয়ের অতি সরলীকৃত রূপ। প্রয়োজনবোধে দুই বা ততোধিক উপভাষা ভ্যারাইটির আরও জটিল ধ্বনি পরিবর্তনের রূপ প্রকাশের পাশাপাশি তাদের অন্তর্নিহিত রূপের সংগঠন বর্ণনার জন্য দ্বিরীতিসংশ্রয়ের সূত্র অনেক জটিল রূপ ধারণ করতে পারে। মৌলটন (১৯৬০) সুইজারল্যান্ডের জার্মান উপভাষার ধ্বনিরূপের অন্তঃসূত্র ব্যাখ্যার স্বার্থে এ রকম জটিল দ্বিরীতিসংশ্রয় তৈরি করে নাম দিয়েছিলেন নির্দেশনাত্মক দ্বিরীতিসংশ্রয় (instructive diasystem)।

বাংলার বিভিন্ন উপভাষার ধ্বনি পরিবর্তন ও ধ্বনির সাদৃশ্য বর্ণনাসম্পৃক্ত দ্বিরীতিসংশ্রয় নির্মাণের পাশাপাশি সাংগঠনিক উপভাষাতাত্ত্বিকরা বাংলার প্রমিত রূপের ধ্বনিমূল তালিকার বিভিন্ন ধ্বনির ঔপভাষিক রূপের দ্বিধ্বনিমূল (diaphoneme) রূপ তৈরি করতে পারেন। দ্বিধ্বনিমূল হচ্ছে কোনো ভাষার ধ্বনির প্রমিত রূপের উপভাষাগত বৈচিত্র্য। এ পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন ড্যানিয়েল জোনস (কোলিন্স ও মিস ১৯৯৯)। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা /এ/ ধ্বনি প্রমিত রূপে শব্দের বিভিন্ন প্রতিবেশ অনুযায়ী /এ/ এবং /অ্যা/ এই দুই রূপেই উচ্চারিত হয়। আবার কোনো কোনো উপভাষায় যথা ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুমিল্লায় প্রচলিত

বিভিন্ন শব্দের অধিকাংশ প্রতিবেশেই তা /অ্যা/ রূপে উচ্চারিত হয়। এ বাস্তবতাকে মনে রেখে ভবিষ্যৎ বাংলা সাংগঠনিক উপভাষাতাত্ত্বিকরা অন্বেষণ করতে পারেন অন্যান্য উপভাষায় এ ধ্বনিটির আরও দ্বিধ্বনিমূলগত বৈচিত্র্য আছে কিনা। এধরনের পর্যবেক্ষণ বাংলা ধ্বনিমূল তালিকার অন্যান্য ধ্বনিমূলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সাংগঠনিক উপভাষাতত্ত্বে এ ধরনের পর্যবেক্ষণ সমৃদ্ধ বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে যে নতুন উপশাখা গড়ে উঠেছে তাকে দ্বিধ্বনিতত্ত্ব (diaphonology) বলা হয়, যেটি মূলত বিভিন্ন উপভাষার দ্বিধ্বনিমূলগত সম্পর্ক বর্ণনা করে। আশা করা যায়, বাংলার বিভিন্ন উপভাষা ভ্যারাইটির দ্বিধ্বনিমূলতত্ত্ব আলোচনা বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

সাংগঠনিক উপভাষাতত্ত্বের পাশাপাশি বাংলা ভাষায় সৃষ্টিশীল উপভাষাতত্ত্বের চর্চাও নানা কারণে গুরুত্ববাহী। এই প্রবন্ধের ১.৪.৩. উপ-অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, একটি ভাষার বিভিন্ন উপভাষা ভ্যারাইটিতে ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক উপভাষাতত্ত্ব দুটি প্রচলিত সমস্যা মোকাবেলায় ব্যর্থ হওয়ার কারণে উপভাষাতত্ত্বে সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্বাদি প্রয়োগের মাধ্যমে সৃষ্টিশীল উপভাষাতত্ত্বের যাত্রা শুরু হয়। এটি উপভাষাতত্ত্ব চর্চার অতি সাম্প্রতিক ধারা বলে বাংলা ভাষায় এর প্রয়োগ পদ্ধতি এখনও শুরু হয়নি। তবে এ ধারার চর্চা ও অনুশীলনও যে বাংলাভাষার বিভিন্ন রূপের অন্তঃকাঠামো বিশ্লেষণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে তা এখানে একটি নমুনা প্রধানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সৃষ্টিশীল উপভাষাতত্ত্ব এ ভাবনায় স্থিতধী যে, একটি ভাষার বিভিন্ন উপভাষা ভ্যারাইটির সংশ্লিষ্ট ভাষিক উপাদানের জন্য একটি অন্তর্নিহিত রূপ সংগঠন রয়েছে যা উপভাষার বহিঃস্তরের বিভিন্ন নিয়ম ও প্রতিবেশের কারণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, প্রমিত বাংলার একটি শাব্দিক ক্যাটাগরি 'ঘর' যা কিশোরগঞ্জ উপভাষায় বহিঃস্তরের প্রতিবেশগত শর্তের প্রভাবে এর অভ্যন্তরে এক ধরনের ধ্বনিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 'গর'-এ পরিণত হয়। এ ধরনের পরিবর্তনের আন্তরসূত্র সম্পর্কে মোরশেদ (১৯৮৫) বলেন যে, প্রমিত বাংলায় cvc প্যাটার্নের জাঙ্কচারহীন একাক্ষরিক শব্দের মধ্যবর্তী স্বর যার আদি ও অন্ত্য অবস্থানে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে, সেসব শব্দের স্বর দীর্ঘ হয়। প্রমিত বাংলার এ ধরনের শব্দ আবার স্বল্পপ্রাণীকরণের মাধ্যমে কিশোরগঞ্জ উপভাষার প্রতিনিধিত্বকারী শাব্দিক উপাদানে পরিণত হয়। এই ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়াটিকে সৃষ্টিশীল উপভাষাতত্ত্বে নিম্নোক্ত বিন্যাসে সহজেই প্রকাশ করা যায়।

অন্তর্লীন স্তর (UR)	# g^hɔ r # ঘর
↓ জাঙ্কচারহীন একাক্ষরতা + আদি ও অন্তে ব্যঞ্জনধ্বনি > দীর্ঘীকরণ	# g^hɔːr #
↓ ভূমিস্তর (PR) (প্রমিত বাংলা)	# g^hɔːr #
স্বল্পপ্রাণীকরণ > অল্পপ্রাণ	# gɔːr #
ভূমিস্তর (PR) (কিশোরগঞ্জ উপভাষা)	# gɔːr #

চিত্র ৫ : ফিডিং প্রণালির সাহায্যে ব্যাখ্যাকৃত সৃষ্টিশীল রীতিভিত্তিক বাংলা ধ্বনি পরিবর্তন (ডবরোভস্কি ও হিগিন্স, ২০০১ অবলম্বনে)

উপরের চিত্র ৫-এ বর্ণিত সূত্র ব্যাখ্যা করে যে বাংলা ভাষার house ধারণার একটি অন্তর্নিহিত শাব্দিক ক্যাটাগরি হচ্ছে g^hɔːr (ঘর)। কিছু প্রতিবেশগত শর্ত, যেমন একাক্ষরিকতা, জাঙ্কচারহীনতা, আদি ও অন্তে ব্যঞ্জনধ্বনি ইত্যাদি থাকার কারণে এর স্বর /ɔ/ প্রমিত বাংলায় দীর্ঘস্বরে /ɔː/ পরিণত হয়েছে। আবার একইভাবে পরবর্তী কোনো সময়ে মহাপ্রাণহীনতা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এর প্রথম ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণে পরিণত হয়ে কিশোরগঞ্জ উপভাষার প্রতিনিধিত্বকারী শাব্দিক ক্যাটাগরি 'গর' (gɔːr)-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

জ্ঞানমূলক ভাষাবিজ্ঞান (cognitive linguistics) মানুষের ভাষা সংগঠন তথা পদক্রম, শব্দক্রম বা বাক্যিক সংগঠনকে তার একান্ত বিনির্মিত নিজস্ব সংগঠন — যা তার মনোজগতের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট — বলে মনে করে (Ungerer & Schmid, ১৯৯৬)। আর এই সংগঠন বিনির্মাণ স্বভাষী (native) ব্যতীত অন্য কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। ফলে এই সংগঠন বিনির্মাণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের জন্য গড়ে উঠেছে শাব্দিকীকরণ (lexicalization), ব্যাকরণীকরণ (grammaticalization) নামক তাত্ত্বিক অভিধা। উপভাষা বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটিকে যদি জ্ঞানমূলক ভাষাবিজ্ঞানের এই তাত্ত্বিক অভিধাসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করি তাহলে বলা যায় যে, বাংলা উপভাষার নির্দিষ্ট ভাষীরা যে ব্যক্যিক, পদ বা শব্দ সংগঠন বির্নিমাণ করে তা তাদের নিজস্ব মনোজাগতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা অন্য উপভাষীর পক্ষে নির্মাণ করা সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট বাংলা উপভাষীর মনোজাগতিক প্রক্রিয়াজাত ভাষা সংগঠনের তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য জ্ঞানমূলক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা উপভাষা বিশ্লেষণও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

৪. উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উপভাষা অভিধাটি প্রধানত ভাষার স্থানিক রূপকে সূচিত করলেও অর্থাৎ এটি একটি ভাষামণ্ডলের স্থানগত বা আনুভূমিক রূপটিকে ব্যঞ্জিত করলেও, ভাষার উল্লম্ব বিশ্লেষণও এক্ষেত্রে গৌণ নয়। বরং একটি ভাষার বিভিন্ন রূপের পরিপূর্ণ আভ্যন্তর কাঠামো উন্মোচনের জন্যে এর স্থানগত অর্থাৎ আনুভূমিক এবং কাল, মর্যাদা, পেশা ও জাতিগত অর্থাৎ উলম্ব বিশ্লেষণ উভয়ই সমান গুরুত্ববাহী। আর এক্ষেত্রে বর্তমান উপভাষাতত্ত্বে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, সমাজ-ভাষাবিজ্ঞান সম্মিলিত প্রয়াসে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলা ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে যদি এ অবস্থাটিকে বিবেচনা করি, তাহলে এ দুটি দৃষ্টিকোণই বাংলা উপভাষাসমূহের বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সমানভাবে প্রযোজ্য। কেননা বাংলা উপভাষাসমূহের স্থানিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হলেও তা অসম্পূর্ণ এবং খণ্ডিত। আর তার পূর্ণতা সাধনের জন্য সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্র ও তথ্যাদি প্রয়োগের পাশাপাশি সৃষ্টিশীল ও রূপান্তরমূলক ব্যাকরণ এবং জ্ঞানমূলক ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব প্রয়োগের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। আর এ মাধ্যমে বাংলা উপভাষাসমূহের যে আন্তরসূত্র ও কাঠামো উন্মোচিত হবে তা বাংলা ভাষার পরিপূর্ণ ব্যাকরণ রচনায় সবিশেষ ভূমিকা রাখবে। অন্যদিকে বাংলা ভাষার ঔল্লম্বিক বিশ্লেষণ আমাদের অবহিত করবে এর আভ্যন্তর কাঠামোর নিরবচ্ছিন্ন পুনর্নির্মাণ ও পুনর্গঠনতত্ত্ব সম্পর্কে।

টীকা

১. সমগ্র বাংলা ভাষার কেন্দ্র হিসেবে এ অঞ্চলের পরিস্রুত রূপটিকে সকল উপভাষাতাত্ত্বিক মেনে নিয়েছেন। তবে গোপাল হালদারের (১৯৮৬) মতে, এই কেন্দ্রের ব্যাকরণিক রূপে বাংলা ভাষার কিছু প্রত্ন বৈশিষ্ট্য (archaic characteristics) বর্তমান। মূলত, এই প্রত্ন বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ ব্যাকরণ রূপটি কীভাবে মধ্যযুগে ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপে পরিবর্তিত হয়েছে তার জন্য দেখুন শহীদুল্লাহ (১৯৬৫) ও বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯১)।

২. স্বাধীন বাংলাদেশে বর্তমানে ঢাকা পূর্ববাংলার উপভাষার কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিচিত হওয়ার বিষয়টি অনেক উপভাষাতাত্ত্বিকও মেনে নিয়েছেন। এ জন্য দেখুন হালদার (১৯৮৬) ও বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯১)।

৩. কিশোরগঞ্জের উপভাষা বাংলা উপভাষা শ্রেণিবিভাগতত্ত্বে সুনীতি কুমার (২০০২) অনুসারে 'বঙ্গ' (vanga) বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে গ্রিয়ারসন-এর LSI অনুসারে প্রাচ্য শাখার পূর্ববঙ্গীয় উপশ্রেণির পর্যায়ভুক্ত। আবার গোপাল হালদার (১৯৮৬) তাঁর পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার বর্ধিত শ্রেণিবিভাগে কিশোরগঞ্জের উপভাষাকে এর বিভিন্ন ভাষিকরূপের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গ্রুপ-১-এর অর্থাৎ Dacca-Eastern-এর 'পূর্ব-ময়মনসিংহ'-এ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। উল্লেখ্য, ময়মনসিংহ জেলার আয়তনিক বিশালতা ও পৃথক ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কারণে হালদার (১৯৮৬) এর উপভাষাকে 'ময়মনসিংহ' এবং 'ময়মনসিংহ-পূর্ব' এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

আরিফ, হাকিম. ২০০৩. 'জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন', *বাংলা পিডিয়া* [সম্পা. সিরাজুল ইসলাম], ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ২৪৪-২৪৫

আজাদ, হুমায়ুন. ১৯৯৮. *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী।

ইসলাম, রফিকুল. ১৯৯৮. *ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার. ১৯৯১. *আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান*, কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মনিরুজ্জামান. ১৯৯৪. উপভাষা চর্চার ভূমিকা, ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

মোরশেদ, আ.কা.ম. (সম্পা.). ২০০৭. *'ভাষা ও সাহিত্য' : বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা*-৬, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন. ১৩৬৮. *সিলেটি ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ. ১৯৯৮ [১৯৬৫]. *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স।

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ. ১৯৬৫. *পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

সরকার, পরিত্র. ১৩৯৮. *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*, কলিকাতা : চিরায়ত প্রকাশনী

হক, মুহম্মদ এনামুল. ১৯৯১. "চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্য-ভেদ", মনসুর মুসা (সম্পা.)-*মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ. ৪৭৯-৬০৫

Chambers, J.K. and Trudgill, Peter. 1998 1980. *Dialectology*. Cambridge University Press.

Chatterjee, S.K. 2002. *The Origin and development of Bengali language*. New Delhi : Rupa. co.

Chowdhury, Munier. 1960. "The Language Problem in East Pakistan". *International Journal of American Linguistics*. Part III, vol. 26, No. 3, P. 64-78

Collins, Beverly and Mees, Inger .1999. *The Real Professor Higgins : The Life and the career of Daniel Jones*. Berlin & New York : Mouton de Gruyter

Dobrovolsky, Michael and Czaykowska-Higgins, Ewa. 2001. "Phonology : the Function and Patterning of sounds". In William O' Grady and Collegues [eds.]

Contemporary Linguistics. New York and Boston : Bedford/st. Martin's, P. 62-130

Grierson, G.A. 1966. *Linguistic survey of India*, vol. 1, vol. V, New Delhi : Motilal Banarridass.

Haldar, G. 1986. *A comparative Grammar of East Bengali Dialect*, Calcutta : Puthipatra.

Moulton, W.G. 1960. "The short vowel systems of northern Switzerland : a study in structural dialectology." *Word* 16 : P. 155-183.

Morshed, A.K.M. 1985. *A study of standard Bengali and the Noakhali dialect.* Dhaka : Bangla Academy.

Parker, F. and Riley, K. 1994. *Linguistices for Non-Linguists.* Needham Heights, MA : Allyn and Bacon.

Petyt, K.M. 1980. *The Study of Dialect.* London : Andre Deutsch Limited

Schilling-Estes, N. 2006. Dialect variation. In Ralph Fasold and Jeef Connor-Linton (eds.) *An Introduction to Language and Linguistics.* Combridge University Press.

Trask, R.L. 1996. *A Dictionary of Phonetics and Phonology.* London and New York : Routledge.

Trudgill, P. 1994. *Dialect.* London and New York : Routledge

Ungerer, Friedrich and Schmid, Hans-Jorg. 1996. *An Introduction to Cognitive Linguistics*, Essex : Long mann.

Weinreich, Uriel. 1954. "Is a structural dialectology Possible?" *Word.* Vol. 10, No. 4, P. 388-400.